বিবিধ প্রবন্ধ

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন প্রণীত।

প্রকাশক

সরকার এণ্ড কোং

৭১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্।

PRINTED BY J. N. BOSE.

COLLEGE SQUARE, CALCUTTA.

1909

ভূমিকা।

সাধারণ নীতি ও কতিপয় সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় "বিবিধ প্রবন্ধ" প্রথম ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম ভাগের দুই একটী বিষয় উচ্চ শ্রেণীর বালকদের দ্বারা যাহাতে প্রকৃষ্ট প্রণালী ক্রমে আলোচিত হইতে পারে, দ্বিতীয় ভাগে প্রধানতঃ তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর প্রবন্ধগুলি বেকন, বেন্থাম, রাস্কিন্ ইত্যাদি সুধিগণ ও গ্রন্থকারের নিজের আলোচনার ফল। এই শেষোক্ত কারণে প্রবন্ধগুলি সকল বিদ্যালয়ে আদর পাইবে কিনা বলিতে পারি না। এই প্রবন্ধগুলিতে বিদ্যার তৎসংক্রান্ত জ্ঞানের বিস্তার বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে বিশেষ কোন রীতি অনুসরণ করি নাই। আমাদের বর্ত্তমান দেশ কাল ও পাত্র বিচার করিয়া, বালকগণ যাহাতে বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে ক্রমে সংসারের, সমাজের, স্বদেশের ও রাজার সহিত সাধারণ সম্বন্ধ আলোচনা করিতে শিক্ষা করেন, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করা বিবিধ প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ভাষায় জ্ঞান থাকা এক কথা এবং চিত্তরঞ্জিনী ভাষায় সকল বিষয় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা অন্য কথা। কেবল এই শেষোক্ত বিষয় দেখিতে গেলে আমার অনধিকার চর্চ্চা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ে আলোচনা করিবার শক্তি উপার্জ্জনে চেষ্টাবান হওয়া সকলের উচিত; এবং এ বিষয়ে দৃষ্টি সংকীর্ণ হইতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এই কারণে প্রবন্ধের বিষয় ভাগ করিয়া দেওয়া আমার মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। যুবক পাঠকগণ যদি প্রথম প্রবন্ধটীর মত নিজেরা বিষয় ভাগ করিয়া

লয়েন, তাহা হইলে অন্য প্রবন্ধ লিখিতে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে। বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষক কর্তৃক প্রবন্ধ বিভাগ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

নানা জাতীয় প্রবন্ধ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইতে পারে না। তথাপি এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া বালকদিগের চিন্তাশক্তি যদি গভীর হয়, এবং অধিকাংশ বিষয় চর্চ্চা, আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া যদি বিদ্যার সহিত তাহাদের জ্ঞানও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। ইতি

গবর্ণমেণ্ট কমার্শ্যাল ক্ল্যাসেস
কলিকাতা,
১৭ই আষাঢ় ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

নিবেদক
শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন।

সূচী।

বিবিধ প্রবন্ধ।

STRENGTH OF CHARACTER.

চরিত্র-বল।

চরিত্র-বল মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন। অলঙ্কার মধ্যে মুকুটের ন্যায়, দেহে মস্তকের ন্যায়, জ্যোতিষ্কের মধ্যে দিবাকরের ন্যায়, চরিত্র-বল মনুষ্য-জীবনের প্রধানতম ভূষণ এবং অতুলনীয় দীপ্তির আকর। ইহা মানবের অবাস্তব ও অশরীরী সার সম্পত্তি। ইহার অভাবে মনুষ্য বিদ্যায় নিষ্ফল, ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য, এবং সমাজে ও গার্হস্থ্য জীবনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া থাকে। এই অমূল্য ধন ক্রয় করিবার নহে—বিক্রয় করিবার নহে—বিলাইবারও নহে। ইহা নিজের অপ্রতিম সুফল নিজে আনয়ন করে। ইহা কেবল বিবেকবান্ মানবেরই নিজস্ব সম্পত্তি;—বিবেকহীন ইতর প্রাণীর ইহা লাভ করিবার অধিকার নাই। এইজন্য অনেকে বলিয়া থাকেন যে, চরিত্রহীন মানবে ও পশুতে প্রভেদ নাই। অতএব চরিত্র-বল মনুষ্যজীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় পদার্থ। ইহা জগতে স্বর্গীয় সুখপ্রাপ্তির প্রধান নিদান।

জীবনের উন্নতিসাধন করিতে হইলে চরিত্র-বলই প্রধানতম সম্বল। চরিত্রবান্ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে কেহই সন্দেহ করে না। তাঁহার ভাষায় শিক্ষিত বিনয় নাই; তাঁহার কার্য্যে আড়ম্বর নাই, মনে অভাবের দারুণ বিভীষিকা নাই, তাঁহার অন্তঃকরণ সন্তোষ-সুধায় নিত্য নিষিক্ত থাকে; হৃদয় ক্ষমাগুণে

Strength of character. How it helps to attain success in life.

সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে। ক্রোধ বা অমর্ষের প্রচণ্ড বহ্নি তাঁহার মনোমধ্যে কখনই স্থান পায় না। তাঁহার বিবেক পরিমার্জ্জিত; কামনা অপরের মঙ্গলানুষ্ঠানের হেতুভূত। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ পূর্ণ না হইলেও তাঁহাকে অভাবের তীব্র কষাঘাত কদাপি সহ্য করিতে হয় না। আশার ক্ষণপ্রীতিকর ছলনা তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। বস্তুতঃ তাঁহার সমস্ত সদ্‌গুণের সমষ্টিরাশি হইতে এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ উদ্ভূত হইয়া তাঁহার জীবনকে সর্ব্বসুখের, সমগ্র সম্পৎসারের এবং এক অনভিভবনীয় ক্ষমতার আকর করিয়া রাখিয়া দেয়। সেই অপ্রমেয় ক্ষমতার কাছে দিগ্বিজয়ীরও বলবিক্রম বিতথ হইয়া পড়ে। এই ক্ষমতাবলে বলীয়ান হইয়া কি সমাজে, কি গার্হস্থ্যজীবনে, কি কর্ম্মকর্ত্তার সমীপে বা স্বয়ং কর্ম্ম-কর্ত্তৃরূপে তিনি সর্ব্বত্রই ও সর্ব্ববিধ ব্যাপারে সাফল্যলাভ করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়া থাকেন।

আস্থা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস তাঁহার নিত্য সহচর। তাঁহার বাক্য দৈববাণীর ন্যায় সকলের প্রাণে অপার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উৎপাদন করে; তাঁহার উপদেশ সর্ব্বসিদ্ধি ও চতুর্ব্বর্গের পূত প্রস্রবণ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়;—তাঁহার আদেশ সর্ব্বমঙ্গলময়ের ইচ্ছা বলিয়া সকলেই অবিচারিতচিত্তে পালন করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। সংসারের কণ্টকা-কীর্ণ দুর্গম গিরিগহ্বরে, নৈরাশ্যের নিবিড় স্তব্ধ শ্মশানপথে, সেই চরিত্রবান্ পুরুষ কখনই স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন না। হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা, কদাপি তাঁহার ত্রিসীমায় প্রবিষ্ট হইতে পারে না। লোভ, কপটতা, কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা তদীয় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পুণ্যপূত হৃদয় হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থিতি করে। এইরূপে সকল সদ্‌গুণের সমষ্টিসমূহে সর্ব্বদা শোভমান থাকিয়া সংসারের সমুদায় কার্য্যেই তিনি সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

সচ্চরিত্র অপার্থিব সার সম্পত্তি। জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত ইহার কোন

সম্বন্ধ নাই। নিরক্ষর কৃষক ও তীক্ষ্ন ধীশক্তিসম্পন্ন দুরূহ বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানপটু ব্রাহ্মণ—সকলেই ইহার সমান অধিকারী হইতে পারেন। পক্ষান্তরে বিপুল শিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চকুল-গর্ব্বিত হইলেই যে, সেই স্বর্গীয় সম্পত্তির অধিকারে সমর্থ হওয়া যায়, এমত নহে। সেই জন্য ইহা অতিশয় দুর্লভ। কাঞ্চন-সংসর্গে কাচও যেমন মরকত মণির দ্যুতি প্রাপ্ত হয়, সচ্চরিত্রের সংযোগে সেইরূপ নিরক্ষর কৃষিজীবী বা মেষপালকও জগতের বরেণ্য হইয়া থাকে। তীক্ষ্নধীশক্তিসম্পন্ন, বা কমলার অপার কৃপাপাত্র ব্যক্তি চরিত্রধনে বঞ্চিত থাকিলে কোথাও গৌরবলাভে সমর্থ হয়েন না। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ বা কার্য্যাদির ফল অধিককাল স্থায়ী হয় না। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিবিদ্যা বা অতুল ধনসম্পত্তির সাহায্যে যশঃ অর্জ্জন করিতে পারেন, অথবা মিষ্ট কথায় লোকের মনোহরণ করিতে সমর্থ হয়েন; কিন্তু অবিমিশ্র শান্তিসুধার স্বাদলাভ তাঁহার ভাগ্যে কখনও ঘটিয়া উঠে না; কারণ তদীয় দুশ্চরিত্রের দাবদাহে তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা দগ্ধ হইতে থাকে। যখন শৈশবের সেই কলঙ্কবিহীন শুভ্রজীবনের কথা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয়, যখন কোন শিশুর নিষ্পাপ বদনমণ্ডল তাঁহার নয়নগোচর হয়, অথবা যখন ভগবানের কথা অন্তঃকরণে ঘনাবৃত আকাশে সৌদামিনীর মত আবির্ভূত হইতে থাকে, তখন কি এক অব্যক্ত আকুল যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ হইতে থাকে, তাহা সেই ব্যক্তিই অনুভব করিতে সমর্থ। চরিত্রহীন ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠতা সম্ভবপর নহে, অথবা প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা সম্ভূত হইলেও তাহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। কারণ তাঁহার মনে সর্ব্বদাই বহুবিধ সন্দেহের বিভীষিকা বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার হৃদয় নরকানলে দগ্ধ করিতে থাকে। চরিত্রহীন ব্যক্তি যেমন অপরকে সন্দেহ-পূর্ণ লোচনে সমীক্ষণ করে, অপর ব্যক্তিও তাহাকে সেইরূপ বিশ্বাস করিতে পারে না। পটুতা বা চতুরতার সাহায্যে সে এককালে প্রভূত

A man of ordinary talents with character compared with a man of genius without it.

অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্তু প্রতিজ্ঞাপালন বা কর্ত্তব্যপালনে অপারগতা বশতঃ তাহার বাজারসম্ভ্রম একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তখন নগদ দাম না দিলে কেহই বিশ্বাস করিয়া জিনিষ ছাড়িয়া দেয় না। কেননা সকলেরই মনে এই ধারণা হয় যে, সুবিধা পাইলেই চরিত্রহীন ব্যক্তি ফাঁকি দিবে। আজিকালি দেউলিয়া আদালতে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া অনেকে উত্তমর্ণকে প্রতারিত করিয়া থাকে। এই বঙ্গদেশে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা মনীষার অভাব নাই; কিন্তু এই সঙ্গে যদি অনেকের চরিত্র-বল সংযুক্ত থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গালীর জাতীয়জীবন শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইত। বাঙ্গালীর প্রখর বিদ্যাবুদ্ধির সহিত একাধারে চরিত্র-বল জড়িত নাই বলিয়া এ দেশের বাণিজ্য ব্যবসায় অপর জাতিদ্বারা সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে এবং সেই জন্যই বোধ হয় সম্ভূয়সমুত্থান বা যৌথকারবার বঙ্গে স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। উপাধিভূষিত বিদ্যাগর্ব্বিত চরিত্রহীন যুবক বাক্‌পটুতা সাহায্যে স্বদেশহিতৈষণা বা ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের ভাণ করিয়া সভামঞ্চে স্বীয় সযত্নসঞ্চিত প্রগল্‌ভতার পরিচয় প্রদান করিতেছে; কিন্তু বিপুল পরিশ্রম-বিনিময়েও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে, চরিত্রবান্ পুরুষ স্বীয় সচ্চরিত্রের সম্পৎসারে সুশোভিত হইয়া সর্ব্বত্রই আপনার বিজয়নিশান নিখাত করিতেছেন। চরিত্রহীনের স্বদেশহিতৈষিতা, কিংবা ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারের প্রয়াস সামান্য বাধা পাইলেই জলবুদ্বুদের ন্যায় উত্থিত হইয়াই বিলীন হইয়া যায়; অথবা প্রতীপ প্রবৃত্তি-স্রোতে দূরে প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু চরিত্রবান্ পুরুষ আপনাকে আদর্শরূপে স্থাপিত করিবার নিমিত্ত যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাতেই অচল অটল হিমাদ্রির ন্যায় উন্নত থাকেন বলিয়া সর্ব্বত্রই সাফল্যলাভ করেন এবং তাঁহার অপ্রতিম চরিত্রবল তাহার জয়ঘোষণা করিতে থাকে।

সমস্ত কর্ম্ম অর্থ দ্বারা সম্পন্ন হয় না। চরিত্রবান্ ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও স্বীয় মানসিক বল সাহায্যে অর্থসাধ্য সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে

পারেন। কিন্তু চরিত্র-বলসাধ্য একটীও কার্য্য চরিত্রহীন ব্যক্তি দ্বারা সংসাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। একের প্রতাপ সীমাবদ্ধ,—অপরের প্রতিভা বিশ্ব-ব্যাপিনী। একের আদর ও আপ্যায়ন তাহার অনুগত কতিপয় নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট;—অপরের পূজা সভ্যসমাজের প্রত্যেক মানবের প্রাণে প্রাণে পরিবর্দ্ধিত। তুমি ধনীর ধনবলের নিকট মস্তক অবনত করিতে প্রস্তুত নও, কিন্তু চরিত্রবান্ দরিদ্রের পদতলে সর্ব্বস্বের মূল হৃদয় অকাতরে হাসিতে হাসিতে পুষ্পাঞ্জলিরূপে নিবেদন করিতে পার। রামচন্দ্র চণ্ডাল গুহকের নিকট সখ্যবন্ধনে আপনি বাঁধা পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ত্রিভুবনবিজয়ী দেবতাপন রাবণকে পরম শত্রুরূপে নিহত করিয়াছিলেন। অর্থ মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারে; কিন্তু অপরের হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। দরিদ্র ভয়ে অভিভূত হইয়া ধনীর পদে নমস্কার করিবে;—তাহার চক্ষু অর্থের তীব্র জ্যোতিতে ঝলসিত হইবে; কিন্তু ধনীর ব্যবহারে সে হৃদয় ভরিয়া কখনও বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে না;—ধনীর নিকট নিজের সমস্ত অভিলাষ কখনও ব্যক্ত করিবে না।

Character more potent than wealth.

সুরম্য প্রাসাদবাসী চরিত্রহীন ধনকুবের অপেক্ষা সামান্য পর্ণকুটীরবাসী চরিত্রবান্ দরিদ্র, সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ অর্থ মানবকে গর্ব্বিত করে; তাহাতে মানব অপরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃক্‌পাত করিতে অভিলাষী হয় না। যৌবনোদ্ধত অর্থবান্ মানব দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া রিপুর দাস হইতে চাহে এবং অর্থের অপব্যবহার করিয়া কুপ্রবৃত্তির আবিল তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে স্বতঃই ধাবমান হয়। প্রলোভনের প্রবল বাত্যা যখন মানবকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে, তখন মানব চরিত্ররূপ দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মরাজের সিংহাসন সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেদিন পাপপুণ্যের হিসাব দিতে

হইবে, সে দিন ভ্রষ্টচরিত্র ঐশ্বর্য্যশালী মানব অপেক্ষা চরিত্রবান্ সামান্য কৃষক কত নির্ভয়,—কত প্রফুল্ল। চরিত্রের সহিত ধনের তুলনা কখনই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; কারণ একটী স্বর্গের সার সম্পত্তি, অপরটী মর্ত্তের বাসন্তী বল্লরী। একটীর সাহায্যে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও লাভ করিতে পারা যায়, অপরটী দ্বারা পার্থিব জীবনের কেবল ক্ষণপ্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। ধন মনুষ্যকে কচিৎ দেবভাবাপন্ন করিতে পারে; বরঞ্চ কুপথে লইয়া যায়; কিন্তু চরিত্র মানবকে দেবদুর্ল্লভ পদেরও অধিকারী করিয়া থাকে। অতএব ধন অপেক্ষা চরিত্রের শক্তি শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

Its attendant virtues — perseverance, moral courage, and self-help

বিনয়, শিষ্টাচার, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অটল ধৈর্য্য, প্রবল ন্যায়পরতা, অসীম সৎসাহস, ঐকান্তিক পরদুঃখকাতরতা, অদম্য অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন, কঠোর ইন্দ্রিয়দমন প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় অম্লান মালিকার ন্যায় চরিত্রবান্ পুরুষের চিরশোভা বিস্তার করে। এই সকল গুণগ্রামের পরস্পরের এমনই দৃঢ় সম্বন্ধ যে, একটী সূত্রচ্যুত হইলে এই অমূল্য চরিত্রমালা দেখিতে দেখিতে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া যায়। নানাপ্রকার প্রলোভন বিবিধ মোহিনী মূর্ত্তিতে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তোমাকে কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু তোমাকে দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের কাঁটার মত সর্ব্বদাই নির্ভীক ও অটলভাবে স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। নানাপ্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব বিপদ তোমার সম্মুখে উত্থিত হইয়া তোমার ধৈর্য্য হরণ করিতে পারে, কিন্তু তোমাকে সর্ব্বদাই হিমাদ্রিসদৃশ অটল থাকিতে হইবে। নানাপ্রকার ভীষণ দৃশ্য তোমার অন্তঃকরণে বিভীষিকার সঞ্চার করিতে পারে, কিন্তু সেই বিষম সঙ্কটে—সেই দারুণ দুর্ব্বিপাকেও চিত্তের দৃঢ়তা ও সূক্ষ্ম ন্যায়পরতা অক্ষুন্ন রাখিয়া কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য বা কোমল কার্পণ্য অনেক সময় অলক্ষিত ভাবে চিত্তের বিক্ষেপ সাধন করিয়া পাপাচরণে প্রণোদিত

করিয়া থাকে। তখন সহসা পদস্খলন হওয়াতে মানব সম্মান সম্ভ্রমের উচ্চ চূড়া হইতে নিন্দার নিম্ননিখাতে নিপতিত হয়; তখন অনুতাপ ভিন্ন তাহার সান্ত্বনার অন্য কিছু সামগ্রী অবশিষ্ট দেখা যায় না। অতএব সুখ, দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ,—সকল অবস্থাতেই চরিত্র অটুট রাখিতে হইবে। নির্ম্মল চরিত্র সংসারের বিজয়-মুকুট। জগতে জয়শ্রী লাভ করিতে হইলে পাত্র-মাত্রেরই ইহা উপযুক্ত আভরণ।

ইহ সংসারে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পথে শত শত বাধাবিপত্তি উদ্যত রহিয়াছে। সেই সকল বাধাবিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া সঙ্কল্পের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। শোকদুঃখের দারুণ আঘাতে হৃদয় যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে; সেই অবসাদ দূর করিয়া আমাদের প্রাণ নবীন উৎসাহে উদ্দীপিত করিতে হইলে চরিত্র-বলই প্রধান সহায়। দৈবের দোহাই দিয়া অবস্থার বশীভূত হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম। যাহারা সহজেই অবস্থা-স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়, তাহারা জীবন-সংগ্রামের সামান্য প্রখরতায় অধীর হইয়া পড়ে এবং নিজের নানাবিষয়ে ক্ষতি হইলেও সাধ্যমত তাহার প্রতিকার করিতে সাহসী হয় না। সামান্য গার্হস্থ্যজীবনে কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে, কোন কোন ভদ্রব্যক্তি ভৃত্যাদির অভাবে একেবারে অধীর হইয়া পড়েন। সামর্থ্য থাকিলেও গৃহস্বামী স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরস্পরের সাহায্যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন না। কেহ বা শনির দশা পড়িয়াছে বলিয়া ভাগ্যের করে অবিচারিত চিত্তে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। কিন্তু চরিত্র-বলসম্পন্ন ব্যক্তির মন এত সঙ্কীর্ণ নহে। স্বীয় কর্ত্তব্যের সমাধানে বা প্রয়োজন-সাধনে তিনি সমাজকে ভয় করেন না। বঙ্কিমবাবু কপালকুণ্ডলায় লিখিয়াছেন, "নবকুমার জানিতেন না যে, বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত নহে।" বাস্তবিক কি সমাজে, কি ব্যবসায়ে, কি গার্হস্থ্য জীবনে সকল সময়েই অবস্থাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এ বিষয়ে চরিত্র-বলই প্রধানতম অবলম্বন।

ইহ সংসারে রিপুরূপ শত্রুসমূহ প্রতিনিয়তই আমাদিগকে গুপ্তভাবে আক্রমণ করিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদিগের কতই অনিষ্ট সাধন করিতেছে! প্রবীণ সেনানায়কের ন্যায় সেই প্রচণ্ড বৈরীর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে সর্ব্বদাই সাবধান থাকিয়া তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। চরিত্র এই যুদ্ধের প্রধান শস্ত্র। এই শস্ত্রদ্বারা অধর্ম্ম ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। প্রকৃত চরিত্রবান্ পুরুষের মন অতি পবিত্র; সেই পবিত্র মনের প্রবৃত্তিনিচয়, দেবভাবান্বিত এবং তাঁহার আত্মা বিশুদ্ধ। তাঁহার শান্ত উদার ভাবে আদর ও আপ্যায়নের মধুরতা বিজড়িত; তাঁহার বিনয় দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য উপাসক রত্নলিপ্সু হইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। চরিত্র জীবনের সার রত্ন,—ইহা ভগবৎ-প্রাপ্তির শাশ্বতী সোপানপংক্তিস্বরূপ। মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান চরিত্রেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যখন হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে চিরপোষিত পাপগুলি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতে থাকে, যখন মানব প্রেমপূর্ণ প্রাণে অপরের হৃদয় বাঞ্ছা করে, তখনই সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোকে তাহার মনোমন্দির উদ্ভাসিত হয় এবং সে নিজে চরিতার্থ হইয়া থাকে।

The relation of character to spirituality.

রিপুদমনকারী, আত্মনির্ভরশীল, পরদুঃখকাতর, বিনয়ী, ও দেশহিতৈষী, ব্যক্তি সকল দেশেই বিরল। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, যিশু, কবির, মার্টিন লুথার প্রভৃতি যেমন ধর্ম্মবিষয়ে, উইলবারফোর্শ, ক্রমওয়েল, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সেইরূপ সমাজ বিষয়ে উদাহরণস্থল।

Examples in illustration.

JOURNEY HOME DURING THE POOJA VACATIONS.

পূজা-অবকাশে বাটী-যাত্রা।

বর্ষা চলিয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালীন সূর্য্যোদয় ও সুনির্ম্মল আকাশ শরতের বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে। প্রাবৃটের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দর্শনের পর শারদ সূর্য্যের ময়ুখমালা যেন মনের জড়তা ও আবিলতা দূর করিয়া প্রফুল্লতা বিকশিত করিতেছে। বালার্কের প্রথম রশ্মিতে সিক্ত গৃহপ্রাচীর ও অলিন্দগুলি ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে এবং পাদপনিচয় পবনদেবের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইয়া স্থিরভাবে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কক্ষের গবাক্ষ হইতে এই সকল বৈচিত্র্য দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়—না জানি কোন শুভদিন অগ্রসর হইতেছে। শুভদিনের আগমন অপেক্ষা, শুভদিনের আগমনপ্রতীক্ষা কি প্রীতিপ্রদ! ঐ কালের পূর্ব্বস্মৃতি-অনুভবে মন এক বিমল অব্যক্ত আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়। এই সময় হইতে লোকের প্রাণ নিত্য নব নব আশায় যে কিরূপ ভাবে জাগরিত হইতে থাকে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই অনুভব করিতে সক্ষম।

এখনও কলেজ বন্ধ হইতে দশ বার দিন বিলম্ব আছে। গ্রীষ্মাবকাশ যেন বহু অতীতের কথা বলিয়া মনে হইতেছে। বাটীর এক এক খানি পত্র পাঠে আমাকে ক্রমশ অধীর করিতেছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতাভগ্নীর প্রভাত পদ্মের ন্যায় কোমল নির্ম্মল হৃদয়—নব-মল্লিকার ন্যায় "মধুমাখা হাসি-আঁকা" মুখমণ্ডল—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময় কৃপা-কটাক্ষের স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি—মাতার প্রাণভরা স্নেহের সম্ভাষণ—পদস্পর্শন সময়ে মস্তকে পিতৃদেবের

করস্পর্শন এককালে মানসচক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া আমাকে অভিভূতের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে।

কলেজের ছুটির পর এখন আর ফুটবল খেলা ভাল লাগিতেছে না। প্রত্যহই বৈকালে ভ্রাতাভগ্নী ও মাতাপিতার আকাঙ্ক্ষা ও আদেশানুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী খরিদ করিয়া একত্র করিতেছি। দিন গণিতে গণিতে বাটী যাইবার সময় আসিল।

ক্রমে পঞ্চমীর সুপ্রভাত হইল। আমার সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত। উদ্বিগ্ন হইয়া ঘড়ি দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিল। আমি অতি তৎপর মাল পত্র সমভিব্যাহারে ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে আমার সতীর্থ ও স্বদেশবাসীও চলিলেন। ষ্টেশনের জনতা দেখিয়া মনে আশঙ্কা হইল, বুঝিবা টিকিট কিনিতে না পারিয়া বাটী যাওয়ার সাধে বঞ্চিত হই। কিন্তু ইঞ্জিন পিছু হাঁটিয়া গাড়িগুলি লইয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মনে আশার সঞ্চার হইল—কারণ নিশ্চয়ই গাড়ি ছাড়িতে এখনও বিলম্ব আছে। আমি মালের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলাম; ওদিকে আমার বন্ধু জনতা ভেদ করিয়া দ্বিতীয় ঘণ্টার সময় টিকিটসহ উপস্থিত হইলে আমরা উভয়ে কক্ষে স্থান আছে কিনা বিচার না করিয়া উহাতে প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্বে মনে হইতেছিল গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টাগুলি বুঝি শীঘ্র শীঘ্র বাজিতেছে; এখন মনে হইতে লাগিল—তৃতীয় ঘণ্টায় এত বিলম্ব কেন। আমরা কি স্বার্থপর! আমি এতক্ষণ গার্ডের সবুজ পতাকার দিকে অনিমেষলোচনে দৃষ্টি করিতেছিলাম। ঘণ্টাও বাজিল,—পতাকাও নড়িল—গাড়ীও ছাড়িল; দুই একটি কুলি অধিক পয়সার লোভে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল—টিকিট কলেক্টাররা ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিতে লাগিল এবং ফোঁস ফোঁস করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গাড়ী ষ্টেশনের নিকট বিদায় লইল; বিদায়ের কিছু পরেই মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ সৈনিকের ন্যায় গন্তব্য পথে অধিক তেজে চলিতে লাগিল।

এইবার বসিবার স্থান লইয়া কক্ষে গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। পরস্পরের বাক্যালাপ শুনিয়া মনে হইল যেন পরস্পর স্বার্থপরতা দেখাইতে এক প্রকার কৃতসঙ্কল্প। একটি ভদ্রলোক পত্নীকে স্ত্রীলোকের কক্ষে দিয়া ছেলেগুলিকে লইয়া আমাদের গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। তাঁহারই দেখিলাম বিশেষ কষ্ট। তিনি দুইটি অপোগণ্ডকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছেন—অপর দুইটি দণ্ডায়মান। একটি মাড়োয়ারি পার্শ্বে নিজের সামগ্রী সমেত দুই জনের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। উহা স্থানান্তরিত করিতে বলায় নিজে দুই তিন অঙ্গুলী পরিমাণ স্থানত্যাগ করিয়া—অর্থাৎ কাত হইয়াছিলেন সোজা হইয়া বসিয়া—বলিলেন "আরাম করজীয়ে।" আমার স্বদেশী একজন একটি পা বেঞ্চিতে তুলিয়া ব্যাগে ঠেস দিয়া বসিয়াছেন; অনুরোধে কর্ণপাতও করিলেন না। কিছুপরে বলিলেন বহুপূর্ব্ব হইতেই তিনি ঐ সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া আছেন, যাহা হউক আমি ও আমার বন্ধু আসনত্যাগ করিয়া ছেলে দুটিকে বসিতে দিলাম এবং রুষ্টভাব প্রকাশ করাতে পূর্ব্বোক্ত স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের চৈতন্যসঞ্চার হইল। অহো! শিষ্টাচারে অকারণ কেন এ বাধা—ভাবি নাই সুখের বাটী যাইবার কালে রুষ্টভাব ধারণ করিতে হইবে। এইবার একটি ষ্টেশন আসিল;—দুই একটি নিকটের যাত্রী বিদায় লইল, এবং আমরা বাস্তবিক "আরাম" অনুভব করিলাম। এখন হইতে চতুঃপার্শ্বের শোভা অবলোকন করিতে সক্ষম হইলাম।

উভয় পার্শ্বে শ্যামল প্রান্তর সকল ধবল শ্রী ধারণ করিয়াছে—কোথাও একটি তরু ভগ্নশাখাসহ আপনার মস্তকোত্তোলন করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিতেছে—কোথাও নারিকেল, তাল, সুপারী, আম্র, রসাল বৃক্ষগুলি বাতাহত না হইয়া একতাই বল প্রমাণ করিতেছে—কোথাও ধীবরকুল ভেলায় চড়িয়া মৎস্য ধরিতেছে ও বক চিল্ প্রভৃতি শিকারে বাধা পাইয়া অন্য দিকে উড়িয়া যাইতেছে—কোথাও অজলমগ্ন তৃণশ্যামল ভূপৃষ্ঠে

গ্রামের গাভীগুলি দোহনান্তে বিচরণ করিতেছে—রেলগাড়ীর শব্দে অভ্যস্ত বলিয়া ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না; কোথাও বা কমলার ললিত উদার হাস্য তাহার শস্যক্ষেত্রগুলির সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়া কৃষক হর্ষোৎফুল্ল হইয়া পত্নীকে দেখাইতে লইয়া আসিয়াছে—কোথাও পরিত্যক্ত গৃহের ছাদ নাই, দেওয়াল নাই, গৃহবাসী নাই, কেবল উদ্‌বাস্তুর টগর, জবা ও সেফালিকা বৃক্ষগুলি গৃহস্বামীর সুখদুঃখে নির্লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা ফুলের সময় মনোহর গন্ধ বিতরণ করিয়া বলে,—"তোমার কাজ তুমি কর, আমার কাজ আমি করি";—কোথাও বা নীলাকাশে মধ্যে মধ্যে দুই একখানা সদ্যমথিত নবনীতবৎ জলহারা মেঘ দেখা যাইতেছে।

বাটীর কথা মনে পড়ায় মাইল-পোষ্ট দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম এখনও একটী ষ্টেশন বাকী। গাড়ির বেগ অপেক্ষা মনের বেগ অধিকতর বোধ হইল। আমাদের ষ্টেশনে নামিয়া দেখি, আমাদের কক্ষের উগ্রস্বভাব বাবুটিও ঐ ষ্টেশনে নামিবেন; মুটের অভাবে মাল নামাইতে পারিতেছেন না। আমরা দুই বন্ধুতে তাঁহার সাহায্য করিলাম। ষ্টেশনের বাহির হইতে আমাদের সেই পুরাতন ভৃত্য লাঠি ও লণ্ঠন হস্তে আগ্রহের সহিত উকি মারিতেছিল। টিকিট দিয়া বাহির হইয়া তাহার নিকট বাটীর কুশল শুনিয়া আমরা ঘাটের ধারে অগ্রসর হইলাম। রাস্তায় দেশের অনেক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং অনেকেই বলিলেন তাঁহারাও আমাদের সহিত একই ট্রেণে আসিয়াছেন। আমার একখানি নৌকা আসিয়াছে এবং সন্ধ্যার বিলম্ব আছে দেখিয়া দেশের অনেক অল্পবিত্ত লোক অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের নৌকামধ্যে উঠাইয়া লইয়া পাল তুলিয়া দিয়া আমরা গ্রামাভিমুখে রওনা হইলাম।

খালের ধারে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা অপরাহ্নে গাত্র ধৌত করিতে আসিয়াছে দেখিয়া বোধ হইল কতই সুখ দুঃখের কথা কহিতেছে এবং ভাবভঙ্গীতে মনে হইল পরচর্চায় অনেকেই ব্যাপৃতা; কিন্তু তাহাদের সহচর

কচি কচি ছোলেমেয়েগুলি ডেঙ্গায় থাকিয়া ছড়া কাটিতেছে ও মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছে। কি বিসদৃশ ব্যাপার!—কোথাও বা কেহ বড় মাছ ধরিবার নিমিত্ত বড়সীতে ক্ষুদ্র মৎস্য গ্রথিত করিয়া জলে ফেলিয়া একদৃষ্টে বসিয়া আছে—কোথাও কোন পল্লীর শেষ ভাগ খাল পর্য্যন্ত আসিয়াছে ও কোন পল্লিবাসিনী তাহার প্রতিবেশিনীর সহিত কলহে প্রবৃত্তা রহিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে আমরা গঙ্গা-বক্ষে উপনীত হইলাম। অস্তাচল গমনোন্মুখ রবির শেষ রশ্মিতে নদীর পূর্ব্বাংশ দ্রবীভূত স্বুবর্ণের ভাব ধারণ করিয়াছে। ভরা নদীবক্ষে নৌকার উপর দাঁড়াইয়া মাঠের হরিতবর্ণ ধান গাছের উপরেও দেখি স্বর্ণচ্ছটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের ঘাটে উঠিয়া বহুপরিচিত ঘোষ বৃদ্ধের গোশকট প্রস্তুত দেখিলাম। গাড়িতে উঠিয়া দেখি রাস্তা হইতে জল সরিয়া গিয়াছে এবং জল-রেখা থাকিলেও রাস্তা প্রায় শুখাইয়া আসিয়াছে। তবে স্থানে স্থানে সামান্য কর্দ্দমসংযুক্ত জল বদ্ধ হইয়া আছে। আমার গ্রামের বালকদের সহিত এইবার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা দলপুষ্ট হইয়া নৌকা চালাইতেছে। "নগী" ঠেলিয়া কোন্ নৌকা শীঘ্র যায়, তাহারই ফলাফল দেখিতে উৎসুক। পথে কোথাও বাঁশঝাড়ের শাখা হেলিয়া পড়িয়াছে—কোথাও বট শিকড় ঝুলাইয়া দিয়াছে। এই ঘন বনের মধ্যে বাঁকা পথে যাইতে যাইতে বোধ হইল যেন কিছু পূর্ব্ব হইতেই প্রদোষতিমির আসিয়া ছাইয়া ফেলিল এবং দীঘির কাল জলে শরৎচন্দ্রের প্রতিফলিত সিতাংশুলেখা নয়নগোচর হইতে লাগিল। এদিকে দূরে পল্লীর নীরব শান্তি ভগ্ন করিয়া শঙ্খধ্বনি মরমে পশিতে লাগিল। হৃদয় এক অব্যক্ত আনন্দহিল্লোলে আন্দোলিত হইল। ডা—ডা করিয়া গাড়ি মোড় ফিরিল আর সে বন পিছনে রহিয়া গেল এবং আমিও বাটীর সদর দরজা দেখিতে পাইলাম।

গাড়ি হইতে নামিয়া প্রতিমার কিছু দূরে পটমণ্ডপে গিয়া পিতৃদেবের

চরণ কমল স্পর্শ করিলাম এবং আমার মস্তকে তাঁহার করস্পর্শ সুখ অনু-ভব পূর্ব্বক সমাগত দুই একজনের প্রশ্নের সঙ্ক্ষেপে উত্তর দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। ভ্রাতাভগিনীর প্রিয় সম্ভাষণ ও হর্ষময়ী মাতার স্নেহ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকোত্তোলন করিয়া দেখি আমি আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত। গৃহের তপ্তব্যঞ্জনের বহুপরিচিত ঘ্রাণ কত অতীতের কথা মনে আনিতে লাগিল। আহারান্তে সকলে পিতৃদেবের আহার দেখিতে গেলাম। আমার আনীত বড় বাজারের মিষ্টান্নের কত না সুখ্যাতি শুনিলাম। কনিষ্ঠেরাও মিষ্টান্ন ও অন্যান্য সামগ্রী আনিয়াছি বলিয়া পুনরায় আমার সুখ্যাতি করিতে লাগিল—কত গল্প চলিতে লাগিল। আগামী কল্য হইতে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর আরও কত আমোদ! শরদা-কাশের তলায় ছাদে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম আমি এতকাল এই সুখ-শান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধাস্বাদে বঞ্চিত ছিলাম—মনে হইল "আজ যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।"

THE STUDY OF HISTORY;—ITS INFLUENCE ON THE PROGRESS OF INDIVIDUALS AND NATIONS. DISCUSS THE REMARK USUALLY MADE THAT, THE HINDU MIND IS AVERSE TO THE STUDY OF HISTORY.

ইতিহাস পাঠ।

ইতিহ অর্থাৎ পরম্পরাগত উপদেশ যাহাতে আছে, তাহাকে ইতিহাস কহে।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষ্যতে॥

ইতিহাস চতুর্ব্বর্গ-লাভের প্রধান সাধন, কারণ কি উপায়ে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করা যাইতে পারে, তাহার বিবরণ এবং তদুপযোগী উপদেশমালা ইতিহাসে বর্ণিত থাকে। ইহা অতীতের সাক্ষী এবং বর্ত্তমানের সহচর। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীতের গর্ভে অনন্ত লয় প্রাপ্ত হইতেছে;—সঙ্গে সঙ্গে কত মহিমমণ্ডিত রাজ্য, কত সভ্যতাগর্ব্বিত সাম্রাজ্য, কত মদস্পর্দ্ধিত জাতি কোথায় বিলীন হইয়া যাইতেছে;—আবার কত নগণ্য অভিনব জাতি উহাদের পতনের কারণ মানস-নয়নের সম্মুখে জ্বলদুদাহরণ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিসোপানে আরূঢ় হইতেছে এবং সভ্যতার অভিমানে স্ফীতবক্ষে বিশাল ভূতধাত্রী ধরিত্রীকে শরাবখণ্ডের ন্যায় জ্ঞান করিতেছে। স্বল্পায়ুঃ মানব এই সমুদায় প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম না হইলেও লোকপরম্পরাগত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরবর্ত্তী মানবের

জন্য নিজেদের বহুদর্শিতার ফল লিপিবদ্ধ বা প্রস্তরে খোদিত করিয়া রাখিয়া যাইতেছে। ইতিহাস এইরূপে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের এক অচ্ছেদ্য গোত্রবন্ধন দ্বারা পৌর্ব্বাপর্য্য স্থাপন পূর্ব্বক সত্যের মহিমা জগতে প্রচার করিতেছে।

ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত ভাবেই হউক অতীত কাহিনী ও অতীত অবস্থার, উত্থান ও পতন, ঘাত ও প্রতিঘাতের এক জীবন্ত প্রতিবিম্ব মানবের সর্ব্বদাই মর্ম্মস্পর্শী ও শিক্ষাপ্রদ। ইতিহাস কেবল অতীত ঘটনাসমূহের তিথি বারাদির পঞ্জিকা নহে,—ইহা ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীরগণের অবদানপরম্পরা এবং তত্তৎসম্ভূত জাতীয় উন্নতির নিদর্শনগ্রন্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে জাতির ইতিহাস নাই, তাহাদের উন্নতি সুদূরপরাহত; কারণ বর্ত্তমানের সহিত অতীতের তুলনা করিবার তাহাদের কিছুই নাই। ইতিহাসহীন জাতি জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৈববিড়ম্বিত; কারণ তাহারা জাতীয় জীবনের প্রধান উপাদান অতীত ঘটনাবলী হইতে বঞ্চিত।

মানব দেবতা নহে, সুতরাং তাহার ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। কেবল নিজেদের কেন, অপর দেশের ইতিহাস পলে পলে মানবকে অতীতের ভ্রান্তিজনিত বিপত্তির কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়া ভবিষ্যতের উন্নতির নিমিত্ত প্রস্তুত করাইয়া রাখে। কোন মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিলে মন সহসা তদীয় লোকোত্তর কীর্ত্তিকলাপে নিমগ্ন হইয়া পড়ে এবং তাঁহার অনুপম সদ্‌গুণাবলীর অনুকরণে স্বতঃই ব্যগ্র হইয়া থাকে। যিনি যুদ্ধব্যবসায়ী, তিনি যদি কোন বীরপুরুষের জীবনী পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ধমনীতে শোণিতপ্রবাহ বিদ্যুদ্বেগে ছুটিতে থাকে,—তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রণরঙ্গে নাচিয়া উঠে; যুদ্ধশিক্ষায় তাঁহার উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। হলদিঘাট যুদ্ধে বিরাট মোগল অক্ষৌহিণীর সম্মুখে মুষ্টিমেয় রাজপুত বীর-পুরুষ প্রমত্ত প্রভাবে প্রতি[illegible] প্রচণ্ডতা প্রশমন করিতে যেরূপ পৌরুষ

যে সময়ে পাশ্চাত্য জগতের অনেক স্থানে ধর্ম্মের সামান্য নিদর্শনও দেখা যায় নাই; সাহিত্য-বিজ্ঞানের অতি ক্ষীণ জ্যোতিঃও প্রবেশলাভ করে নাই; অজ্ঞানের নিবিড় অন্ধকারে, স্বার্থের অবিচারিত পূর্ণ তৃপ্তিবিধানে, পাশবী প্রবৃত্তির আবিল তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া যখন তাহারা পরস্পরের হৃদয়শোণিত-পানে প্রবৃত্ত ছিল, পবিত্র ভারতভূমি তখন পুণ্যশ্লোক বীরগণের অমর-লীলায় যেন সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠত্ব ধারণ করিয়া সুমেরুর ন্যায় বিরাজ করিত। তখন ভারতের যোদ্ধা জিগীষাপ্রণোদিত হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সহ অভিযানোদ্দেশে সুদূর দেশে আপতিত হইতেন;—ভারতীয় আর্য্য নৃপতি, ত্রয়ী বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া শাশ্বতী দণ্ডনীতির অনুসরণপূর্ব্বক প্রজার মঙ্গলাভিপ্রায়ে বিহিত উপায়ে রাজধর্ম্ম পালন করিতেন; ভারতের ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যায় বিশারদ হইয়া সর্ব্বভূতের মঙ্গলার্থ সংযতচিত্তে যথাবিহিত আশ্রমধর্ম্ম-পালনে নিরত থাকিতেন। কিন্তু এই অধঃপতিত ভারতে অতীত গৌরবের ভস্ম-রাশির উপর বসিয়া আজি আমরা যে, তাহার আলোচনা করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, এই উপায়ে আমরা মনোবৃত্তিনিচয়কে দমিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

এই সুবিশাল মানব-সমাজ ভিন্ন ভিন্ন মানব মাত্রের কার্য্যপরম্পরার ফলসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন্ কোন্ কার্য্য কিরূপ অনুলোম ও বিলোম প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া কীদৃশ ফল প্রসব করিবে, এবং সেই ফল মানব-সমাজের উপর কিরূপ শক্তি নিষিক্ত করিবে, ইতিহাস তৎ-সমুদায় ব্যাপার বিশ্লেষিত করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়া দেয়। সমাজ-শরীর কিরূপে স্ফূরিত হয়, কোন্ কোন্ বিষয় ইহার স্ফূর্ত্তিলাভে সহায়তা করে, কিরূপে সভ্যতার সূচনা, উন্নতি ও পরিণতি ঘটে, বাহ্য ও অন্তর্জগতের কোন্ কোন্ ধর্ম্ম ইহার প্রধান সহায়; কি উপায়ে কোন্ কোন্ সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং বিপরীত বিধির অনুবর্ত্তন করিয়া কোন

কোন্ সমাজ একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে; ইতিহাস-পাঠে তৎসমস্ত বিষয় জানিতে পারা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অবাধ বাণিজ্যপ্রথা ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহার প্রচার হয়, এ কথা জানিবার নিমিত্ত ইতিহাস-পাঠের আবশ্যকতা দেখা যায় না; কিন্তু রক্ষিত বাণিজ্যপ্রথা রহিত হওয়ায় অবাধ বাণিজ্যের প্রচলনে কিরূপে ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাই জানিবার প্রয়োজন এবং এই জন্যই ইতিহাস-পাঠ একান্ত আবশ্যক।

বীরপূজা সমুদায় সভ্যসমাজেই সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদান বলিয়া সর্ব্বদা পরিকীর্ত্তিত। যে জাতির মধ্যে বীরপূজার আদর নাই, যাহাদের ইতিহাস নাই, সভ্যজগতে তাহাদের স্থান বহু নিম্নে—অথবা নাই বলিলেও হয়। বীরপূজায় হৃদয় প্রশস্ত, অন্তঃকরণ উন্নত, বুদ্ধি কর্ম্মফলা হইয়া থাকে। আবার একমাত্র ইতিহাসের অভাবেই বীরপূজার কল্পনা পর্য্যন্তও হৃদয়ে স্থান পায় না। যে দেশের অতীতের জ্বলন্ত চিত্র নয়ন সমক্ষে নৃত্য করে না, সে দেশ বর্ব্বর জাতির আবাসযোগ্য। অনুদারতা, অদূরদর্শিতা, উন্নত প্রথা-প্রবর্ত্তনে ভীতি ও কুণ্ঠা সেই দেশে পরিলক্ষিত হয়। অতএব ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনগঠনে ইতিহাস প্রধান সহায়।

হিন্দুরা ইতিহাস-চর্চ্চা ভাল বাসেন না, একথা এক প্রকার আংশিক সত্য। হিন্দুদিগের পুরাণ ও ইতিহাস পঞ্চম বেদরূপে পরিগণিত; সুতরাং ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যে সকল ব্যক্তি অন্য দেশে বীর বলিয়া পূজিত, ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতে তাঁহারা দেবতা বলিয়া অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন। সেই সকল দেবতার কার্য্য এক সময়ে হিন্দুমাত্রেরই স্মরণীয় ও শ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় বলিয়া বিবেচিত ছিল। তৎকালে লোকে সেই মহাপুরুষগণের সেই সকল অবদান দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া বীরবিক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। যে দিন গৃহে গৃহে সেই সকল মহনীয় কীর্ত্তিকলাপের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই দিন

হইতে সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের কুটিল মাহাত্ম্যে—ভবিতব্যতার ভয়াবহ সাফল্যে সেই অনুপম সভ্যতার সামান্য নিদর্শনও অবশিষ্ট আছে কি না সন্দেহ।—যাহা কিছু আছে, তাহার অধিকাংশই রূপকালঙ্কারে আচ্ছন্ন ও অনেক স্থলে অত্যুক্তিজালে জড়িত। অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে সেই অলঙ্কার উন্মোচিত এবং অত্যুক্তিজাল অপসারিত করিয়া ঐতিহাসিক সত্যনিচয়ের আবিষ্কার করিতে হইবে। সেই সকল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবরণের অধিকাংশ রূপকালঙ্কারে আচ্ছন্ন হইলেও আজি ঐতিহাসিকের একমাত্র অবলম্বন;—অন্ধকারময় অতীত কালগর্ভে প্রবেশ করিবার একমাত্র আলোক। যে সকল অবদান সাহায্যে মানবগণ সভ্যতার সুবিস্তৃত পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া থাকে, তৎসমুদায় তন্নতন্নরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের তত্তৎকালীন রীতিনীতি ও শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। ভারতের অধঃপতনের সহিত হিন্দুর মতিগতির প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল বীরকীর্ত্তি মনন, স্মরণ ও অনুসরণের শ্রেষ্ঠ বিষয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, আজি কালদোষে বর্ত্তমান অধঃপতিত হিন্দুগণ তৎসমুদায়কে মানবের সাধ্যাতীত অননুকরণীয় দেবকীর্ত্তি ভাবিয়া দূর হইতে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া থাকে। এই সকল সঙ্কীর্ণমনা দুর্ব্বলচিত্ত হিন্দুর ধারণা এই যে, সেই সকল দেবকীর্ত্তি অনুকরণের বিষয় নহে,—কেবল পূজা ও স্মরণের সামগ্রী। সেই জন্যই অত্রি ও ভৃগুর আত্মবলিদান, দধিচির আত্মোৎসর্গ, অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের স্বার্থত্যাগ, শ্রীরামের সত্যরক্ষা ও পিতৃভক্তি, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও ত্যাগস্বীকার, যুধিষ্ঠিরের বিশ্বপ্রেম, ও কর্ণের বদান্যতা আজি কবিগাথার স্থান অধিকার করিয়াছে। লোকে স্বেচ্ছাবশতঃ তৎসমস্ত অতুলনীয় সদ্‌গুণের অধিকার করিতে সাহসী হয় না। এই সকল ব্যাপারের অনুশীলন করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, হিন্দুর ইতিহাস ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ইতিহাস পুরাণকথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

হিন্দুর স্বাধীনতা গিয়াছে, তথাপি তাহারা পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয় নাই। এক কথায় তাহাদের সব গিয়াছে, আছে কেবল "হিন্দুয়ানী"। এই হিন্দুয়ানী ও সামাজিক ব্যবহার বজায় রাখিতে অনেকের নিকট এখনও "কুলজি" সকল বর্ত্তমান। কিন্তু সমাজ-শরীর কিরূপে গঠিত ও ভগ্ন হইল, ঐ সকল কুলজি হইতে তাহার নিরূপণে কি সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে? বিবাহাদি সামাজিক সংস্কারে কুল নির্ণয় করিতে হইলে তৎসমুদায়ের আবশ্যকতা অনুভূত হয় মাত্র; নতুবা যাহাকে প্রকৃত ইতিহাস বলে, সেই সকল "কুলজি" হইতে তাহার কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না।

THE SEASONS OF INDIA.

THEIR DURATION, THEIR BEARING ON DOMESTIC LIFE, TRADE AND PRICES OF ARTICLES. GAMES AND FESTIVITIES OF THE SEASON—THEIR CROPS, FRUITS AND FLOWERS. DISEASES PECULIAR TO EACH SEASON AND RULES OF HEALTH TO BE OBSERVED TO AVOID THEM.

ভারতের ঋতু সকল।

সাগরাম্বরা অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনী নগরাজকিরীটিনী ভারতভূমির প্রায় অধিকাংশ প্রদেশ ষড়্ঋতুর লীলানিকেতন। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয়টী ঋতু পর্য্যায়ক্রমে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই স্ব স্ব প্রভাব প্রকাশিত করে এবং প্রত্যেকটীর আগমনে বসুমতী নূতন নূতন শোভায় সজ্জিতা হইয়া থাকেন। এইরূপে ধরিত্রী নব নব বেশে সুশোভিত হইলে ঋতুগণের প্রভাব জড় ও জঙ্গম জগতের প্রায়

সর্ব্বত্রই অনুভূত হয়। প্রত্যেক নূতন ঋতুর আগমনে ভারতবাসী নব আবেশে,নবীন জীবনে ও অভিনব উদ্যমে সেই সেই ঋতুর অনুযায়ী জীবনের কর্ম্মে অনন্তলীলাময় সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় অবস্থার বশীভূত হইয়া আপনাকে কখন ভাসাইয়া দেয়, আবার কখন বা অবস্থাকে বশীভূত করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে জগৎ সন্তাপিত ও তুমুল ঝটিকাপ্রবাহে কম্পিত করিয়া গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয়। নিদাঘের দিবাভাগ বাস্তবিকই নিদারুণ। সমস্ত দিন জগৎকে তাপিত করিয়া যখন তপনদেব অস্তাচল-শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, যখন প্রদোষের কাঞ্চনবিনিন্দিত সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট শেষ সূর্য্য রশ্মি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ নব নব শোভা বিস্তার করিতে করিতে সান্ধ্য গগনে মিশিয়া যায়, তখন পুনরায় এক অভিনব উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। আকাশের এক কোণে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ অল্পে অল্পে স্বীয় আয়তন বৃদ্ধি করিতে করিতে ক্রমে বিরাট্ দেহ ধারণ করিয়া সমস্ত নীলাকাশ ছাইয়া ফেলে;—অমনি বজ্রানল উদ্গীরণপূর্ব্বক ভীষণ শব্দে কৃষকের আনন্দবর্দ্ধনার্থ কর্ষিত ভূমির তৃষ্ণা নিবারণ করে, কখনও বা তাহাদের মনে নৈরাশ্যের সঞ্চারপূর্ব্বক তুমুল ঝটিকাপ্রবাহ সহসা সমুত্থিত হইয়া প্রকাণ্ড পাদপ সকলকে উৎপাটিত করিয়া ফেলে এবং জলদজাল দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া ধরাবক্ষে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করে। আবার কখনও বা ঝড়বৃষ্টি একত্র মিলিত হইয়া প্রকৃত "কালবৈশাখীর" কঠোর কল্পকলাপের আলাপন করিতে থাকে। আবার পরক্ষণেই নিশাগমে নীলাকাশে বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণশশধর উদিত হইয়া অমল ধবল কৌমুদী-চ্ছটায় ভীত জগৎকে স্নাপিত করিয়া জীবহৃদয়ে আশ্বাসের শান্তিসুধা ঢালিয়া দেয়।

গ্রীষ্মে বসুন্ধরা কেমন বিবিধ ফলফুলে সুশোভিতা! আম্র-কাননের

কেমন সুন্দর শোভা! নয়ন একবার দেখিলে আর ফিরিয়া আসিতে চাহে না। পক্ক, সুপক্ক, অর্দ্ধপক্ক রসাল ফলগুলি দর্শকের মনে আনন্দ-রসের সঞ্চার করিয়া কেমন সুন্দরভাবে বৃন্তের সহিত ঝুলিয়া রহিয়াছে; মলয় পবনে হেলিতেছে দুলিতেছে এবং পবনদেব প্রবল বেগ ধারণ করিলেই বৃন্তচ্যুত হইয়া আশা-প্রোৎফুল্ল ঊর্দ্ধমুখ বালকবালিকাগণের মনোরথ পূর্ণ করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। তাহারা মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের তাপ গ্রাহ্য করে না, বৃক্ষস্বামীর ভ্রুকুটিতে ভীত হয় না; স্নেহময়ী মাতার ক্রোড় ছাড়িয়া যাইতে চিন্তা করে না। তাহাদের সদ্যোমথিত নবনীতবৎ কোমল উদার প্রাণ অতি অল্পে সন্তুষ্ট। সংগৃহীত আম্রগুলি তাহারা কখন ভক্ষণ করিতেছে, কখন বা আহ্লাদের তরঙ্গে হাস্যের সঙ্গে যে চাহিতেছে তাহাকেই বিতরণ করিতেছে।

এই সময় প্রখর সূর্য্যকিরণে নদ নদী, খাল বিল ও পুষ্করিণী প্রায় সমস্তই শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়। নৌকা-চলাচলের উপায় রুদ্ধ হয়, এই জন্য গো-শকট ও রেল ভিন্ন মাল-পরিচালনের সুবিধা হয় না। ইক্ষুগুড়, দেশী আলু, তরিতরকারি ও রবিশস্য ইত্যাদির বহুল পরিমাণে ব্যবসায় হয়। আম জাম কাঁটাল প্রভৃতি সুরসাল ফল খাইয়া গ্রীষ্মাবকাশে বালকগণ পাঠগৃহের কথা বিস্মৃত হইয়া কান্তিপুষ্ট সুস্থ দেহ ধারণ করিয়া থাকে। বেল্লী, গন্ধরাজ, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া জগৎকে আমোদিত করে। হৃষ্টপুষ্ট শরীরে হাস্যবদনে প্রফুল্লচিত্তে বালকগণ মনের আনন্দে ফুটবল বা গ্রাম্য ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত হইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কৃষকেরা অঙ্গসঞ্চালনসাধ্য বিবিধ ব্যায়াম দ্বারা বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছে। কাহারও গৃহে শীতলা বা ওলা দেবীর কৃপা হওয়াতে হাহাকার রব উঠিয়াছে। কেহবা পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক পানীয় জল গরম ও পরিষ্কৃত করিয়া এবং খাদ্যদ্রব্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বাস্থ্যরক্ষণে সচেষ্ট হইতেছে, এবং জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কল্পনাসুখে বিভোর বা

পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া সুখশান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধাস্বাদ করিতেছে। দশহারার গঙ্গাস্নান, সর্পভীতি নিবারণের মানসে দুগ্ধপান, এবং অম্বুবাচির পূর্ব্ব হইতে হিন্দুরমণীদিগের ফলাহার-সঞ্চয় যে কতদিন হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

নিদাঘের অবসানে প্রাবৃটের অবিশ্রান্ত ধারাপাতে প্রকৃতির সাম্য পরিদৃশ্যমান হয়। মৃতপ্রায় তৃণাবলী নব বারিসংস্পর্শে সজীব হইয়া বসুন্ধরাকে নব সাজে সজ্জিতা করে। পুষ্করিণী, নদ নদী ও খাল বিল জলে পরিপূর্ণ হইয়া মানব-মনে এক নূতন আনন্দের স্রোত আনিয়া দেয়। ধনী, ধীবর ও নৌকাজীবীর আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং অতিবৃষ্টির আতিশয্যে পর্ণকুটীরবাসিগণের উটজাবলী ভগ্ন হইলে তাহারা মেঘবারির সহিত অশ্রুবারি মিশাইতে থাকে। প্রয়োজনের অনুরূপ বৃষ্টি হইলেই কৃষকের আনন্দ, নচেৎ অতিবৃষ্টিতে মাঠ ঘাট ভাসিয়া গেলে সমস্ত হাজিয়া পচিয়া শুধু কৃষক কেন গৃহস্থ মাত্রেরই নিরানন্দ উপস্থিত হয়। তরি তরকারী দুর্ম্মূল্য হয় এবং যাহারা পূর্ব্ব হইতে ইন্ধনাদির সঞ্চয় করিয়া রাখে নাই,তাহাদের তন্নিবন্ধন অত্যন্ত অভাব ও ক্লেশ অনুভব করিতে হয়।

রোপিত ধান্য ও পাটের ক্ষেত্রগুলি সজীব ভাব ধারণ করিল। কমলার ললিত উদার হাস্য কৃষকের শস্যক্ষেত্রগুলির সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল। গ্রীষ্মের পনস রসাল এখনও ফুরায় নাই, প্রকৃতির বঙ্গভাণ্ডারে কাঁটাল ও আনারস অপর্য্যাপ্ত, কালজাম, জামরুল ও কদলী ভক্ষণ করিয়া বালকগণের আশা পরিতৃপ্ত হইতেছে না। ক্ষুদ্র বালিকেরা সুর করিয়া বলিতেছে

এ রথেতে যাবনাক উল্টো রথে যাব,
দুই ভায়েতে যুক্তি করে কাঁটাল কিনে খাব।

পল্লীগ্রামে রথের সময় কি আনন্দ! সুদূর স্থান হইতে, যেখানে রথ চলিলে, সকলেই সেই দিকে ধাবমান। সাত আট দিন ধরিয়া কেবল দোলা-

হল, আনন্দস্রোত, এবং পল্লীবাসীর অভিপ্রেত দ্রব্য সামগ্রীর ক্রয়বিক্রয়। গ্রীষ্মের ফুলগুলি এখনও ফুটিতেছে; এখনও গ্রথিত হইয়া বরমাল্য রূপে পরিণত হইতেছে। "শ্রাবণের ধারা" আরম্ভ হওয়াতে কখন সূর্য্যদেব একেবারে অদৃশ্য হইতেছেন, কখন রাস্তা ঘাট জলমগ্ন হইতেছে এবং বালকেরা কাগজের নৌকা ভাসাইতেছে। দিনরাত্রি জলে খেলা করিয়া কেহ কেহ জ্বর ভোগ করিতেছে, কেহ বা সিক্ত বস্ত্র ও পাদুকা ত্যাগ করিয়া অতি সাবধানে আপনাকে রক্ষা করিতেছে। পশ্চিমাঞ্চলে কূপের জল নষ্ট হইয়া দেশবাসীর উদরাময় পীড়া হইতেছে। আবার সাবধান ব্যক্তিরা জল উষ্ণ করিয়া পান করিতেছে দেখিয়া অনেকে তাহার অনুকরণ করিয়া পীড়া হইতে রক্ষা পাইতেছে।

বর্ষার অবসানে হাসিমুখে শরৎ আসিয়া দেখা দেয়। এই সময়—

"নদী ভরা কূলে কূলে ক্ষেতে ভরা ধান"

* * * *

কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে
নিরাকুল ফুলভরে বকুল বাগান।

প্রান্তর সমুদায় বিকসৎ কাশকুসুমব্যূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া যেন মহাদেবীর অধিবাস-বাসরে শত শত চামর ব্যজন করিতেছে। জলাশয় সকল কমল-কুমুদ-কহ্লার-কোকনদদলে শোভিত হইয়া জগন্মাতার আগমন-পথ চাহিয়া রহিয়াছে; ওদিকে গিরিশিখরের স্বাস্থ্যনিকেতনসমূহে নানা বর্ণের ডালিয়া ফুল ঘনসন্নিকর্ষে প্রস্ফুটিত হইয়া যেন গিরিরাজদুহিতার ধরাবতরণ নিমিত্ত ধরাধরগাত্রে পরম মনোরম আসনাবলী পাতিয়া রাখিয়াছে।

এই সময়ে বঙ্গদেশে অন্তর্বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

পূর্ব্ববঙ্গ ও অন্যান্য স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার পাটের বোঝাই নৌকাগুলি

"ভরা পালে বয়ে যায়,
কোনদিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙ্গে দুধারে॥"

কবে দুর্গাপূজার ছুটি হইবে? এই প্রশ্নের আন্দোলনে বালকেরা ব্যস্ত এবং যত দিন যাইতেছে, ততই দিন গণিতেছে। পল্লীগ্রামে যাহাদের বাটীতে পূজা হয়, মৃৎশিল্পকার প্রত্যহই কাটামে মৃত্তিকা লাগাইয়া ক্রমে যখন মহামায়ার এক একটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গড়িতেছে, বালকেরা প্রত্যহই তাহার সংবাদ লইতেছে। যে দিন রঙ দেওয়া হয় এবং যে দিন সাজ পরাণ হয়, আহা বালকদের কি আনন্দ! ক্রমে যখন দূরদেশ হইতে পূজার অবকাশে সহরবাসী সমবয়স্ক আত্মীয় ও গুরুজনেরা আসিয়া প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর হইতে সকলেই আনন্দরাশিতে আপ্লুত হইতে থাকেন, তখন তাহাদের মনোভাব বর্ণনাতীত। ক্রমে দশমীর দিন আসিল, অশ্রুপূর্ণলোচনে বৃদ্ধেরা দেবীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং বালকবৃন্দ নবসাজে সজ্জিত হইয়া নৌকায় বাজ খেলিতে চলিল। হারজিতের কথা দুই এক দিন চলিল, এবং কি কারণে কি ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার মীমাংসা হইল। ক্রমে ছুটি ফুরাইয়া গেল। যাঁহারা স্বাস্থ্যের নিমিত্ত পশ্চিমাঞ্চলে বায়ুপরিবর্ত্তনে গিয়াছিলেন, তাঁহারাও দেশ হইয়া কর্ম্মস্থানে আসিবার উপক্রম করিতেছেন। বিজয়ার পর হইতে কোলাকুলির কি মধুর মিলন ও আপ্যায়ন! এটী একটী সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা। কি স্বজাতি, কি ভিন্ন জাতি, পরস্পর পূর্ব্বসম্বন্ধের সামঞ্জস্য রাখিতে বা পূর্ব্ব মনোমালিন্য অপসারিত করিতে হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে কৈ এরূপ মঙ্গলময় বিধিত বড় দেখিতে

পাওয়া যায় না। এই বিধির বিপরীত প্রথা-অবলম্বনে পূর্ব্বের প্রাণ-মন-দিয়া সেই আলিঙ্গন-প্রথা যতই নিরর্থক বলিয়া অনুমিত হইতেছে, ততই সমাজ কেন,—জাতীয়তাও যেন শ্লথ ও বিকর্ষিত হইতেছে।

শরতের প্রখর রবিকরে উত্তাপিত হইয়া মানবগণ স্নিগ্ধশান্ত শশধরের স্পৃহা করিতে করিতে বিভাবরীর প্রতীক্ষায় দিনমান অতি-বাহিত করে। দিবাকরের তীব্র তাপে খাল বিল ও পয়ঃপ্রবাহ সমুদায় শুষ্ক হওয়াতে তাহাদের অভ্যন্তরস্থ লতাগুল্মাদির পচন ও বিয়োজন জন্য দুর্বাষ্পরাশি সমুদ্গত হইয়া তরুণ জ্বরের সূচনা করিয়া দিতেছে। এই জ্বর সময়ে সময়ে দেশব্যাপিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া গৃহস্থমাত্রেরই মনে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া থাকে।

শরতের অবসানে হেমন্তের রাজ্য প্রকাশিত হয়। যেন কিছু শীঘ্রই দিবা অবসান হইতে চায়। গৃহস্থের বৈকালীন ভোজ্য-প্রস্তুতিতে অগ্নির ধূম আর উপরে উঠিতে পারিতেছে না। আহারেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অনেকে বৈকালে অন্নের পরিবর্ত্তে গোধূমজাত সামগ্রীতে সন্তুষ্ট। ডেঙ্গোর ডাঁটা, বিলাতী কুমড়া, ঝুনা নারিকেল, কচুর শাক ও ইলিশ মৎস্য ভুলিয়া যাইবার উপক্রম হই-তেছে। পালম শাক, মুলা, নূতন আলু ইত্যাদির গন্ধে তরকারীর বিশেষত্ব অনুভূত হইতেছে। বর্ষা ও শরতে দ্রব্যসামগ্রী যেমন কীটদষ্ট হইতেছিল, হেমন্তে বঙ্গের অধিকাংশ মানব সেইরূপ ম্যালেরিয়া রাক্ষসী কর্ত্তৃক দষ্ট হইতে লাগিল। এই বিষে জর্জ্জরিত হইয়া তাহাদের স্ফূর্ত্তি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। দুর্গোৎসবের অট্টহাসি এখন কাষ্ঠ হাসিতে প্রকাশিত হইতেছে। উদ্যমের পরিবর্ত্তে আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা এখন প্রিয়সহচর হইয়াছে। বর্ষার বারিপাতে উৎফুল্লচিত্ত হৃষ্টপুষ্ট কৃষক স্বহস্তে হলচালনা করিয়া যে ধান্য রোপণ করিয়াছে, আজ সে কি করিয়া উহা কাটিয়া ঘরে তুলিবে গালে হাত দিয়া তাহাই ভাবিতেছে। দ্বিগুণ

মজুরি দিয়া ভিন্নদেশের মজুরের সাহায্যে ধান্যের মূল্যবৃদ্ধি হইবে, তাহা না ভাবিয়া মহাজনকে কিরূপে দ্বিগুণ ধান্য দিয়া ঋণশোধ করিবে, তাহাই ভাবিতেছে। অসময়ে চড়া দামের ধান্য যখন সে ধার করিয়াছিল, তখন তাহার ক্ষেত্রে কমলার কৃপাকটাক্ষ দেখিয়া সে একবারও ভাবে নাই যে, পরে ঋণশোধে অপারক হইবে। ম্যালেরিয়া কর্তৃক আক্রান্ত চক্রের বহির্ভাগে থাকিয়া অনেকে ঐ রোগ হইতে রক্ষা পাইতেছেন বটে, কিন্তু হেমন্তের হিমে অনেকেরই জ্বর কাশী সর্দ্দি হইতেছে এবং অনেকে উষ্ণোদকে স্নান করিয়া ও আপাদমস্তক হিম হইতে আবৃত থাকিয়া আপনাকে রক্ষা করিতেছে। বালকেরা ভূমি শুষ্ক হইয়াছে দেখিয়া ক্রীকেট ও লনটেনিস খেলার আয়োজন করিতেছে। বাগানে গোলাপ ফুল দেখিয়া যেমন বালকদের আনন্দ হইতেছে, কিন্তু প্রাণভরা প্রিয় রসাল ফলের অভাব তাহারা অনুভব করিতেছে। জগদ্ধাত্রী পূজায় সকলের আমোদ না থাকিলেও কালীপূজায় বালকবালিকাপূর্ণ সকল হিন্দু বাটীতেই মহা আনন্দ। আলোকমালায় তাহাদের সকল বাটীই আলোকিত। তাহাতে অমাবস্যার তম কোথায় চলিয়া যায় বলিয়া বোধ হয়। আতস বাজীতে সকলে মুগ্ধ।

হেমন্তের অবসানে শীতের আগমন। শীতের কথায় বাল্যকালের একটী সুন্দর সরল কবিতা মনে পড়ে—

> "বয় উত্তরে বাতাস, বয় উত্তরে বাতাস,
> কুয়াসা ধোঁয়ায় ঢাকা সর্ব্বদা আকাশ॥
> রবি খরতর নয়, রবি খরতর নয়,
> দিন ছোট রাত বড় খুব ঘুম হয়॥"

পর্ণকুটীরবাসীর বর্ষায় যে কষ্ট, শীতেও সেই কষ্ট। উপযুক্ত আচ্ছাদনের অভাবে সে শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, অগ্নির নিকট যে আরাম পাইবে, তাহারও উপায় কম। সামান্য ব্যক্তিদের মধ্যে যে ব্যক্তি অগ্নি

জ্বালিতে সক্ষম, অথবা দূরদর্শী, যে ব্যক্তি ব্যয় সংযম করিয়া ইন্ধন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, অথবা গোময় সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিয়াছে, তাহার আঙ্গিনায় বসিয়া অনেকে জটলা করে। শ্রামিকেরা অধিক সময় কার্য্য করিয়া দ্বিগুণ মজুরি লইলেও ধান কাটা হইলেই, অথবা ধান মাড়াই হইলেই নগদ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া কেহই সেই মজুরি দিতে আপত্তি করিতেছে না। চাষিরা ক্ষেত হইতে মূলা বেগুন কপি বিক্রয় করিয়া প্রত্যহই নগদ পয়সা দেখিতে পাইতেছে এবং সবই খরচ করিতেছে। বড় বড় মহাজনেরা ধান্য খরিদ করিয়া এককাট্টা করিবার প্রয়াস পাওয়ায় টাকার বাজারও চড়িতেছে। বড় বড় ব্যাঙ্ক কয়েক দিনের নিমিত্ত টাকা ধার করিয়া শতকরা ৮।১০ টাকা সুদ দিতেছে এবং মহাজনেরা ১২।১৪ টাকা সুদ দিয়া উহাদের নিকট ঋণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না।

বালকেরা এখন পূরাদমে ক্রীকেট ও টেনিস্ খেলিতেছে এবং বড় দিনে ছুটি পাইবে ও সংক্রান্তিতে পিটাপুলি খাইবে ভাবিয়া আনন্দে বিভোর। কিছু পরেই শ্রীপঞ্চমী। নূতন কুল খাইবার ইচ্ছা দমন করিয়া পল্লীগ্রামের বালকেরা কোন্ ক্ষেত্রে যবের শীষ আহরণ করিতে পারিবে, সেই চিন্তায় ব্যাকুল। শ্রীপঞ্চমীর দিন অনাহারে থাকিয়া বীণাপাণিকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে এই মহা আনন্দ। সকলেরই মুখে

বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।

কোথাও বা বালকেরা বিদ্যামন্দির সজ্জিত করিয়া প্রতিমাপূজার ব্যবস্থা করিতেছে। কোথাওবা অন্য স্থানে সকলে মিলিয়া চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক পূজার ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসঙ্কল্প।

দেখিতে দেখিতে ঋতুরাজ বসন্ত কোকিলের কুহুরব ও ফুলবাস সহ দক্ষিণ হইতে মন্দানিল বহন পূর্ব্বক সমুপস্থিত হইল। শীতের প্রকোপ

কোথায় চলিয়া গেল। প্রতি পবনহিল্লোলে শিশিরশ্রী যতই নষ্ট হইতে লাগিল, ভারতবাসীর মনে ততই নব নব ভাব জাগরিত হইল। বঙ্গদেশে পরীক্ষা-লীলায় যোগদান করিতে হইবে বলিয়া যে ভাব মনে উদিত হইয়াছিল, পরীক্ষার অবসানে লঘু হৃদয়ে নূতন আবেগে বালকদের মনে নব ভাব অঙ্কুরিত হইল। গৃহে পর্য্যাপ্ত ব্যঞ্জন ;—দেশী আলু এখন সুপ্রতুল, বাঁধাকপি ফুলকপির স্থান অধিকার করিয়াছে। নূতন ডাল আমদানী হইতেছে। তরিতরকারি সস্তা দেখিয়া গৃহিণীরা প্রাণভরিয়া সন্তানসন্ততিকে খাওয়াইয়া সুখী হইতেছেন। বৈশাখের ভাবী ঝটিকা নিনাদের কথা ভাবিয়া ফাল্গুনের বিবাহে রোসন চৌকি যেন মধুর বোধ হইতে লাগিল। রবিশস্যের আমদানীতে নয়ালীর মুখে দেশীয় ব্যবসাদার, ব্যাপারী ও আড়তদারগণ সকলেই ব্যস্ত সমস্ত। অন্তর্বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধিতে টাকার বাজার আবার চড়িল। পাওনাদারেরা চড়কের অপেক্ষায় আছেন, কারণ তৎপরেই নূতন খাতা ও অনেক টাকা আদায় হইবে। এদিকে বালকেরা দোলের সময় যেরূপ আমোদ করিয়াছে, চড়কে আর সে আমোদ নাই বলিয়া তাহারা চড়কের নিমিত্ত ব্যস্ত নহে। কবিগণ প্রতি পবনহিল্লোলে প্রতি পিক-কুহুরবে বেল মল্লিকা ও যুথিকার সুবাসে নব ভাবে, নব অনুরাগে কল্পনা-রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। এ ধরামাঝে সকলেই কিন্তু সুখ-শান্তির সুধাস্বাদ পাইতেছে না। কোথাও টীকা লইয়া বসন্ত হইতে রক্ষা পাইয়াও কেহ বা প্লেগে আক্রান্ত হইয়া সংসারে উৎকণ্ঠা ও শোক আনিতেছেন। কোথাও বা ভাগ্যবলে পল্লীগ্রামে কোন কোন গৃহস্থ মাধবী যামিনীর স্নিগ্ধকৌমুদী-প্রতিঘাতে শ্বেতাম্বুদসংপৃক্ত নীলাম্বর তলে বাসন্তীয় মলয় মারুতের মধুর হিল্লোলের সুস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। সংসারের এই বৈচিত্র্য দেখিয়া কেহ কেহ পূর্ব্বজন্ম ও কর্ম্মফলের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন। ঋতু বর্ণন করিতে এক এক

সংসারের এই বারমাসে সঙ্ঘটিত অভূতপূর্ব্ব কত ঘটনাই মনে আইসে। এইরূপে মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু ও বৎসরের পর বৎসর আসিবে। কিন্তু জীবনের যে বৎসরটী গেল, সেটী আর আসিবে না। বৎসরের শেষ দিনে কত কথাই মনে হয়, কত ইচ্ছা হয় নূতন বর্ষে সমস্ত অসমাপ্ত কার্য্যগুলি সাঙ্গ করিব, কিন্তু কার্য্যের আর সমাপ্তি হয় না।

পর্য্যটন। TRAVEL.

পর্য্যটন বা দেশভ্রমণে চিত্তের সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয় এবং নিত্য নূতন বস্তু-দর্শনে মনোবৃত্তি সমুদয় বিস্ফারিত ও জ্ঞানের সীমা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোথাও উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ অভ্রভেদ করিয়া যেন নীরবে যোগমগ্ন রহিয়াছে, কোথাও নিবিড় অরণ্যানী ঘন সন্নিবিষ্ট পাদপমালা এবং দুর্ভেদ্য লতা-প্রতান ও গুল্মব্যূহে বিশাল প্রদেশ সকল আচ্ছাদিত করিয়া বিবিধ শ্বাপদদিগকে আশ্রয় দান করিতেছে, কোথাওবা নদনদীসকল বিশ্ববাসিগণের হৃদয়ে নব নব আশার সঞ্চার করিয়া দূরদেশের অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। নগরের বিচিত্র চটুল শোভা, পল্লী সমুদয়ের শান্ত তরল মাধুর্য্য, প্রান্তর ও মালভূমি সমূহের কর্কশ বন্ধুর দৃশ্য জগতের নানা স্থানে নানা চিত্র প্রকাশিত করিয়া দর্শকের মনে বহুবিধ ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতেছে। নানা রসের আশ্রয়ভূমি ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য অবলোকন করিলে বহুল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর আনন্দলাভ করিতে পারা যায়। কূপমণ্ডুকের ন্যায় এক স্থানে কালহরণ করিলে কখনই এইরূপ শিক্ষা ও আনন্দের অধিকারী হইতে পারা যায় না। সেইজন্য পর্য্যটন করা আবশ্যক।

হিন্দু স্বভাবতঃই ধর্ম্মানুরাগী। যাহাতে ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই,

অথবা যে কার্য্য ধর্ম্ম-সঞ্চয়ের পরিপন্থি, হিন্দু সেরূপ কার্য্যে কিছুতেই হস্তার্পণ করেন না। যে জাতির দৈনন্দিন অতি সামান্য কার্য্যও ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত, সে জাতি পর্য্যটনের ন্যায় একটী গুরুতর ব্যাপার ধর্ম্মের সংস্রব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না; সেইজন্য তীর্থ দর্শন একটী প্রধান কর্ত্তব্য ও শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু মাত্রকেই তীর্থ দর্শন করিতেই হইবে, এবং তীর্থ দর্শন করিতে হইলে তাহাকে নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে হইবে, কারণ হিন্দুর তীর্থ এক স্থানে নহে। দুর্গম গিরিগহনে, দুরারোহ পর্ব্বতে, দুস্তর মরুপ্রান্তরে, দুর্ভেদ্য মহারণ্যে, দুঃসহ হিমানী মধ্যে,—হিন্দুর তীর্থস্থান। পৃথিবী যেমন বিপুল, হিন্দুর ভগবান্ সেইরূপ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিরাজমান। সেই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের মহিমা অবলোকন ও প্রচার করিবার নিমিত্ত আর্য্য ঋষিগণ সমগ্র বিশ্বের আদর্শস্থানীয় ভারতবর্ষের শান্ত ও দুরন্ত স্থান সমুদয়ে নানাবিধ তীর্থস্থানের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সকল তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিলে ধর্ম্মভাবের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে নানাদেশ ও দৃশ্য দর্শন জন্য বিবিধ বিষয়ে লোকের অভিজ্ঞতা-লাভ হইয়া থাকে।

তীর্থদর্শন ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়-সাধনের উদ্দেশ্যে পুরাকালে হিন্দুগণ যে, দেশ ভ্রমণ করিতেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিরল নহে। অনেক প্রাচীন ঋষি ও রাজা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন করিতেন:—রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকগণ ধর্ম্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বকালে, জগতের নানা দেশে প্রবিষ্ট হইতেন; তাহাতে তাঁহাদের দেশ ভ্রমণও করা হইত।

"ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" ব্যয় আমাদের সমাজানুমোদিত নহে, এজন্য তীর্থস্থানে ভারতবর্ষের বহুবিধ লোকের সমাগম অপব্যয় বলিয়া

বিবেচিত হইত না। ব্যবসায়ীরাও তথায় পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করিতে সুবিধা পাইতেন। এই পর্য্যটনে নানা জাতির আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম-চিন্তা ও বিবিধ পণ্যসামগ্রী দেখিয়া অনেক বিষয়ে বিজ্ঞতা জন্মিত এবং বিজ্ঞদিগেরও অনেক কুসংস্কার দূরীভূত হইত।

কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় জ্ঞানলাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিলে অথবা প্রত্যাগমন করিতে অপারগ হইলে সমাজের কতদূর কল্যাণ সাধন সম্ভবপর হয়, তাহা অনেকেই অনুমান করিতে পারেন। যুবা বয়সে পর্য্যটনে ফল হয় না, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্লেটো নিয়ম করিয়াছিলেন যে, চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ বৎসরের পর পরিণত বয়সে দেশ-পর্য্যটন শ্রেয়ঃ।

যাঁহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আলোচনা করিবার শক্তি জন্মে নাই, যিনি কোন কার্য্য-ফল অবলোকন করিয়া উহার কারণ-নির্ণয়ে উৎসুক নহেন, যিনি চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, যিনি একদেশদর্শী, এরূপ লোকের দেশ-পর্য্যটনে বহির্গত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এরূপ লোক বিদেশে গমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন দেশের পরিচ্ছদ ও হাবভাব গ্রহণ করিতে শিক্ষা করেন; এমন কি তথাকার লোকের হাসিও অনুকরণ করিতে কৃতকঙ্কল্প হয়েন এবং বংশপরম্পরাগত মহদনুষ্ঠান-নিচয়ের সুফলগুলির সুধাস্বাদে বঞ্চিত হওয়ায় গৌরব অনুভব করেন। ইংরাজ রমণীর ভ্রমণে কুফল দেখিয়া এবং ইংলণ্ডের ব্যক্তি বিশেষের অপকার হইয়াছিল বলিয়া এককালে ল্যাণ্ডর (Landor) এবং জনসন্ (Johnson)ও ভ্রমণ-বিষয়ে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন এবং পর্য্যালোচনা করিয়া লেকি (Lecky) বলেন যে সকল দেশকে স্বদেশ বলিয়া বিবেচনা এবং শত্রুভাব মন হইতে দূরীকরণ পক্ষে দেশভ্রমণ সবিশেষ সহায়তা করে। বাস্তবিক জাতিগত বিদ্বেষ বিনাশ করিতে হইলে চাক্ষুষ আলাপ আশু সুফলপ্রদ এবং দেশভ্রমণ না করিলে

উহা সম্ভবপর হয় না। আজি কালি রেলখাল ও রাস্তা বিস্তারের সহিত দেশভ্রমণও তত ব্যয়সাপেক্ষ ও অসুবিধাজনক নহে।

এ জগতে কতক লোক চক্ষু নিমীলিত এবং কতকগুলি লোক চক্ষু উন্মীলিত করিয়া গমন করেন। পূর্ব্বোক্ত লোক অপেক্ষা শেষোক্ত লোকের জ্ঞান অধিক বিস্তৃত হয়। প্রত্যেক পাদ-বিক্ষেপে যদি জগতের প্রয়োজনসাধক কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাঁরা তাহার আলোচনা করেন। এই জাতীয় লোকের পর্য্যটন বিজ্ঞতা ও শিক্ষা-লাভের নিদানভূত। আবার এরূপ অনেক লোক আছেন যাঁহারা কাশীধামে যাইয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ এবং বাজারে কিছু সামগ্রী ক্রয় করিয়াছেন মাত্র। যদি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে মানমন্দির, অথবা বরানসীধামের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের অকাতরে বিদ্যাদান এবং অধ্যেতৃগণের ঐকান্তিক অধ্যবসায়, কিংবা সমগ্র ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ধর্ম্মশিক্ষা হইতে তাহার অত্যুচ্চ শিখরে অধিষ্ঠান, বা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় আচারপদ্ধতির সূক্ষ্ম পার্থক্য কিরূপ দেখিলে? তাঁহারা বলেন যে "বিশ্বেশ্বরের পূজা দিতে গিয়াছিলাম, ছেলেদের খেলানা ক্রয় করিয়াছি, মেয়েদের চুড়ি কিনিয়াছি, পিত্তলের বাসন কিনিয়াছি, রাব্ড়ি ও ক্ষীরের খাবারে উদর পূর্ণ করিয়াছি—অন্য কিছুরই ধার ধারি না"। ভাল যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভে তাহার পিপাসা না থাকে ত সামাজিক হিসাবে কি কিছু দেখিবার নাই? ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কত যে কপট সন্ন্যাসী ফকির তীর্থযাত্রীর অর্থভাণ্ডার শূন্য করিয়া দিতেছে, তাহা কি দেখিবার ও শিখিবার নহে?' কত বৃদ্ধ ও গৃহস্থকন্যা কাশীবাসী ও "কাশীবাসিনী" হইয়া যে মাসোহারার বন্দোবস্ত করিয়া তথায় বাস করিতেছে, তাঁহাদের মধ্যে কতগুলি ধর্ম্মের সোপানে কতদূর উন্নত বা অধিরূঢ়? তাহারা কি এখানে আসিয়াও নিজ সমাজ গঠিত করে

নাই? এবং সদ্‌গুরুর অভাবে তাহারা কি দেশের মত এখানেও পরচর্চ্চা করিয়া দিবসের অধিক সময় অতিবাহিত করিতেছে না? অহো! বংশগত গুণাবলীতে সমাজ উন্নীত করিতে সমাজসংস্কারকগণ যখন কৌলীন্য প্রথার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং সেই প্রথার ফলে যখন "আচার বিনয়ো বিদ্যা" প্রভৃতি গুণ-ভূষিত কুলীনের বংশধর তত্তদ্‌গুণে বঞ্চিত হইয়াও বহু বিবাহ করিতে সমাজে বাধা পায় নাই, তাহাদের পরিত্যক্তা কত সধবা কুলীনকন্যা যে রন্ধন করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহা দেখিয়াও কি মনে হয় না যে গুণগ্রামে বঞ্চিত বংশগত কুলীন-পুত্রের সহিত কুলীন ক্রিয়ার বিষময় ফল, কাশীধামে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে! বেনারসী কাপড় পিতলের বাসন ও কাঠের খেলানা ইত্যাদি শিল্পের বিষয় ও বাণিজ্যপ্রিয় লোকের জ্ঞাতব্য বিষয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ও তথায় কিছুকাল সুখে কাল হরণ করিতে পারেন, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুরা সারনাথে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন। ফল কথা কাশীধামে আসিলে যে কত বিষয়ের শিক্ষা লাভ করা যায়, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না।

বাল্যকাল হইতে এইরূপ অবলোকন করিতে শিক্ষা করিলে, কর্ম্ম-ফলা বুদ্ধির বিকাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ব্ববঙ্গের বালকেরা পরস্পর বিদ্রূপ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের এরূপ ধারণা থাকা উচিত যে, সকল দেশেই দোষের অপেক্ষা গুণের ভাগ অধিক পরিদৃশ্যমান। পরস্পরের সম্মিলনে কেবল গুণেরই ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইতে থাকে। যদি আদর আপ্যায়নে পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে তাহার সেবা কর ত' তাহাদের দেশে বেড়াইতে গেলে তাহারও গৃহে তোমার সেবা ও সমাদর অবশ্যম্ভাবী। তখন বুঝিবে তুমি অতিথি-সেবায় তাহার সমকক্ষ কি না। পূর্ব্ববঙ্গের গৃহপতির স্বার্থত্যাগ ও আত্মীয়

প্রতিপালন এবং ক্রিয়া কর্ম্মে তাহাদের আত্মীয় স্বজনের সাহায্য-প্রাপ্তি দেখিয়া তোমার ভ্রমণ সার্থক বিবেচনা করিবে। তোমা-দেরও নানাবিধ গুণাবলীর অনুকরণ করিয়া তাহারা বিদেশ-স্থিতিতে অনেক শিক্ষা লাভ করিবে। এইরূপ শিক্ষিত হইয়া এবং চরিত্র সুগঠিত করিয়া ভিন্ন দেশ-গমনে অনেক শিক্ষা লাভ হয়।

মহামতি বেকন বলেন "ভ্রমণে যুবকেরা শিক্ষালাভ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তেরা বহুদর্শিতার অধিকারী হয়েন। অপর দেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া যিনি তথায় গমন করেন, অনুমান করিতে হইবে যে তিনি ভ্রমণ করিতে না গিয়া বাস্তবিক পাঠগৃহে গমন করেন। সেই দেশের ভাষায় যাঁহার অধিকার আছে এবং যিনি পূর্ব্বে বিদেশে কখন গিয়া-ছিলেন, তাঁহার সহিত তথায় গমন করিলে আরও ভাল। এইরূপ যুবকেরা দর্শনযোগ্য সামগ্রী দেখিতে পারেন, উপযুক্ত জ্ঞানী লোকের সহিত পরিচিত হইতে পারেন এবং তথাকার শিক্ষাযোগ্য সামগ্রী অনুশীলন করিতে সমর্থ হয়েন। এরূপভাবে গমন করিলে তাহারা বাহিরে কিছু দেখিতে পায় না।

বিদেশে যাইয়া তথাকার রাজসদন,—বিশেষতঃ যে সময়ে তথায় দূতের সহিত আলাপ হয়, ধর্ম্মাধিকরণ—যে সময়ে তথায় বিচারকার্য্য প্রচলিত থাকে, যাজকমণ্ডলী, কীর্ত্তিস্তম্ভ, গুপ্তিকৌশল, ঘুট্র, পৌরাণিক বস্তু, ধ্বংসাবশেষ, পুস্তকাগার, বিদ্যালয়, বাদভূমি, উপদেশস্থান, নাবী, উপবন, বিনোদস্থান, আয়ুধাগার, আপণ, পণ্যশালা. ব্যায়ামভূমি, আয়ু-ধাভ্যাস স্থান, নাট্যশালা, রত্নাগার, চিত্রশালা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া উচিত। বিবাহ-উৎসব, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বধদণ্ড প্রভৃতি বিষয়ের ও অন্যান্য রীতিনীতির অনুসন্ধান করা মন্দ নহে। ভাষাজ্ঞান ও :একজন অভিজ্ঞ আদেশ-কর্ত্তার উপদেশ ও রোজনামা লেখা, এই ত্রিবিধ উপায় সহকারে পর্য্যটন করিলে উল্লিখিত বিষয়

সকলের বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে ও বিলক্ষণ লোকজ্ঞতা হয়। এক স্থানে বা এক নগরে অধিক দিন অতিবাহিত করা উচিত নহে। দেখিবার দেখিয়া, জানিবার জানিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করা বিধেয়। এক নগরে থাকিতে হইলেও সর্ব্বদা বাসাবাটীর পরিবর্ত্তন করিয়া নগরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বাস করা উচিত। স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে তথায় উপস্থিত হইয়া উল্লিখিত বিষয় সকল দেখিবার সুবিধা বিধায় তত্রত্য কোন গণনীয় ব্যক্তির নামে একখানি পরিচয়-পত্রের সংগ্রহ করা আবশ্যক। এক দেশে থাকিয়া যদি তত্রাগত বৈদেশিক দূতগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আরও ভাল। এক দেশে যাইয়া নানা দেশের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যাঁহারা তথাকার বড় লোক বলিয়া দেশ বিদেশে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত সবিশেষ পরিচয় রাখিবে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের যেমন নাম, তদনুরূপ চরিত কি না বুঝিতে পারিবে।

বিদেশে থাকিয়া তত্রত্য কোন দলাদলি বা কলহে জড়িত হওয়া উচিত নহে। রূক্ষ কলহপ্রিয় লোকদিগের সংসর্গ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিবে, নচেৎ তাহারা তোমায় দলে টানিয়া লইবে। বৈদেশিক ভাষা বা বেশগ্রহণ করিয়া দাম্ভিকতা করিও না। লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ অসম্ভব গল্প করিও না। দেশভ্রমণের মুখ্য প্রয়োজন এই যে, বৈদেশিক রীতি নীতির সহিত তুলনা করিয়া স্বদেশীয় রীতিনীতির সংশোধনে সমর্থ হইবে।”

বেকন যে জাতীয় ভ্রমণের কথা বলিয়াছেন, উহা নিতান্ত ব্যয় সাপেক্ষ। অধিকন্তু কতকগুলি বিষয়ে যে তিনি দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন, উহা স্বাধীন জাতির দ্রষ্টব্য। আমরা যে সকল সামাজিক শাসনের অধীন, উহার মধ্যে সমুদ্রযাত্রা আমাদের সমাজানুমোদিত নহে। এ প্রবন্ধে সমুদ্রপারে যাইবার বৈধতা ও অবৈধতার আলোচনা

হইতে পারে না। এই সুবিশাল ভারত মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ-ভ্রমণই আলোচনার বিষয়ীভূত।

ভ্রমণে বহির্গত হইলেই মানবকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হয়। কর্ম্ম-সংস্থান হইবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত প্রাত্যহিক আহার-চিন্তা ও সামাজিক বেশভূষার ব্যয়ভার গুরুজনের উপর ন্যস্ত করিতে ও গৃহের পরিচিত ব্যঞ্জনে অভ্যস্ত বাঙ্গালী বিদেশে গিয়া যে কি অসম্ভবরূপে অবস্থার বশীভূত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। পথে কোন সামগ্রীর অভাব হইতে পারে এবং অভাব হইলেই বা উহার প্রতিবিধান-কল্পে কোন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে, কতই বা পাথেয় আবশ্যক, এবং পথিমধ্যে কোন স্থানে কোন সামগ্রী পাওয়া যাইবে, ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতায় ভ্রমণকারীর স্বভাবতই লাভ হইয়া থাকে। হিন্দি ও ইংরাজি ভাষায় কথা কহিতে অভ্যাস হইলে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে মনোভাবের বিনিময় করা সুসাধ্য ও সম্ভবপর হয়। কলিকাতার ন্যায় মহানগরে ভারতবর্ষের সকল জাতিই বিদ্যমান। ব্যক্তি বিশেষের সহিত আলাপ আপ্যায়নের পর তাহাদের পত্র লইয়া বিদেশ-যাত্রার সংকল্প সুফলপ্রদ। বাঙ্গালি কোথায়বা নাই? কোন স্থানে গমন করিয়া তথাকার কোন পরিচিতের পত্র লইয়াও পরিচিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ফলতঃ জিজ্ঞাসু ও শিক্ষার্থী হইয়া ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলে ইতিহাস-কথিত স্থান, আচার পদ্ধতি, গল্পগাথা, শিল্প ও আদব কায়দা সম্বন্ধে স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া উপলব্ধি করা যায়, এবং বিজ্ঞেরও পূর্ব্বেকার কুসংস্কার পরিমার্জ্জিত হয়।

সংসর্গ।

মানব প্রকৃতি সংসর্গপ্রিয়। ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতি অনেক স্থানে তাহাদের সংসর্গ হইতে অনুমিত হয়—এবং প্রকৃতি বিশেষের অভিন্নতায় ব্যক্তিবিশেষ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কুচক্রীর সহিত সরল হৃদয়ের সংসর্গ দেখিলেই বুঝিতে হইবে শেষোক্ত ব্যক্তি কুচক্রীর চক্রে পড়িয়াছেন এবং অনতিবিলম্বেই পরস্পরের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে অপূর্ব্বপরিচিত দুইজন কুচক্রীকে সহসা চিরবন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে দেখা যায় এবং "রতনে রতন চেনে" এ কথার যাথার্থ্য সম্যক্ উপলব্ধ হইয়া থাকে।

"সৎসঙ্গে কাশীবাস অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ" এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। অথচ জগতে প্রকৃত সাধু ও অসাধুর অধিক সঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায় না। অসৎসঙ্গ আশ্রয় করিলে পরিণাম-কঠোর দূষিত কার্য্যে আসক্ত হইতে হয়, হৃদয়ের সদ্‌গুণ বিতাড়িত হয়, অতি তুচ্ছ কারণে লোকগর্হিত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে কুণ্ঠা বোধ হয় না। চৌর্য্যবৃত্তির আপাত মধুর সুখের ফলে কারাগৃহ গমন, মিথ্যাবাদীর প্রতি জগতের অবিশ্বাস ইত্যাদি, পরিণাম-নির্দ্দেশক উপদেশের অভাব নাই এবং সৎসঙ্গের যে অসীম গুণ, তাহা বাল্যকাল হইতে পুস্তকে শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু শিক্ষা করা এক সামগ্রী এবং প্রকৃতি গঠন করা আর এক সামগ্রী। প্রাত্যহিক মিলনে শৈশবে প্রকৃতির ভাঙ্গা-চোরা হইতে হইতে গঠন-কার্য্য সাধিত হইতে থাকে। বাল্যকালে একত্র খেলা ও একত্র পড়াশুনা করিতে করিতে প্রকৃতির ওলট পালট হয় এবং পরে ব্যক্তিগত প্রকৃতি পার্থক্য বা স্বাধীন প্রকৃতির ক্রমবিকাশ হইতে দেখা যায়। তথাপি কি শৈশবে, কি যৌবনে, কি পরে মিশ্রিত প্রকৃতির মানবের সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা নিত্য ঘটিয়া থাকে। ইহ সংসারে সুবিদ্বান্ অথচ চরিত্রহীন

কখনও ধর্ম্মপ্রাণ কখন কুচক্রী, বাহ্যে অমায়িক অন্তরে সঙ্কীর্ণ, ধনী বা ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট বিনয়ী এবং নির্ধন ও নিম্নতম পদস্থের নিকট আত্মগরিমযুক্ত, সমাজে নাম-অর্জ্জনে বা রাজার সম্মানরক্ষার্থ বা উপাধি-ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় মুক্ত-হস্ত, অথচ আত্মীয়ের দুঃখে অবিচলিত ও দরিদ্রের হৃদয়বিদারক কাতর কণ্ঠনিঃসৃত প্রার্থনায় বধির—এবম্বিধ ব্যক্তির সাক্ষাৎ-লাভই সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। আমরা যে মুহূর্ত্তে বিদ্যাগুণে আকৃষ্ট হইয়া চরিত্রহীনতা উপেক্ষা করি, ধর্ম্মগুণে আকৃষ্ট হইয়া কুচক্র দোষাবহ বলিয়া মনে করি না, বিনয়ে আকৃষ্ট হইয়া আত্মগরিমা উপেক্ষা করি, দানে মুগ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ণতা উপেক্ষা করি, সেই সময়েই ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রহীনতা, কুচক্র, আত্মগরিমা, সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদির প্রশ্রয় দিই, অথবা তাহাদের বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির যে, সামঞ্জস্য নাই, তাহা বুঝিয়া ও বুঝি না। কেবল কি আমরা ঐ দোষগুলির প্রশ্রয় দিই? আমাদের অনেকেই সে গুলিকে হয় আবশ্যক বলিয়া অনুমান করেন, অথবা অলক্ষিত ভাবে অনুকরণ করিয়া ফেলেন। কিন্তু বিদ্বান্, বা ধনী, বা বিনয়ী বা দাতার কি সংসর্গের আবশ্যকতা নাই? বিদ্বান্ও সাধুসঙ্গে চরিত্রবান্ হইতে ইচ্ছা করে, ধনীও সরল নির্ধনের সহবাসে সরলতা-শিক্ষার প্রয়াসী হয়, কপটধার্ম্মিক যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণের অভাব অনুভব করে, কপট বিনয়ীও যথার্থ বিনয়ীর অভাব অনুভব করিতে ইচ্ছা করে এবং কপট দাতাও উদার হইতে ইচ্ছা করে।

একাধারে সমস্ত সদ্গুণ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব সৎসহবাস বলিলে বাস্তবিক ব্যক্তি বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন গুণের সহিত সহবাস এবং উহাদেরই অসদ্গুণের পরিহার বুঝায়। কারণ একাধারে, ধর্ম্মপ্রাণ বিদ্বান্, অথচ সাধু ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে হয় এবং স্বভাবদোষে নির্দ্দিষ্ট বহুজনবিদিত হত-ভাগ্যের সংসর্গ ত্যাগ করা কঠিন কথা নহে। বাল্যকালে সংসর্গের প্রভাব

অধিক। পাঠশালার নাম মাত্র দুই একটী বালক ব্যতীত, প্রতিভাবান বালকের সংসর্গলাভ করা অধিকাংশ বালকদের একটী মহান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ক্রমে তাহাদের সহিত মিশামিশি করিতে করিতে তাহাদের গুণাবলীগ্রহণ করিতে অসমর্থ বালকেরা তাহাদের দোষ গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই সময়ে বিদ্যালাভে অপটুকে যদি কেহ বলিয়া দেন যে "তোমার চরিত্র ভাল আছে, এখন হইতে সাবধান। তোমার যে গুণ আছে তাহা অনেকের নাই" তাহা হইলে সে কতকটা আশ্বস্ত হয়। কিন্তু সমাজ নির্দ্দিষ্ট বিদ্যা-লাভে তাহার পশ্চাৎপদতাই তাহার জীবনের কলঙ্ক বলিয়া প্রচার করায় তাহাকে ক্রমিক হতাশ করে। কে জানে ব্যবসায় ক্ষেত্রে চরিত্র-গুণে, অধ্যবসায়ে পরিশ্রম গুণে, প্রতিজ্ঞাপালনে সত্যবাদিতায় এবং বাজারসম্ভ্রম-বর্দ্ধনে সে একদিন কত বড় হইবে? যেমন "সর্ব্বদোষ হরে গোরা" কথাটী আমাদের মেয়েদের মুখে শুনা যায়, সেইরূপ আমরাও মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ও ধন বুঝি সর্ব্বদোষ হরণ করে।

"অল্প বয়সে মিল সহজ, কেন না অল্পবয়সে মানুষের স্বাভাবিক প্রভেদ গুলি কড়া হইয়া উঠে না। যত বয়স হইতে থাকে, আমাদের প্রত্যেকের সীমানা ততই নির্দ্দিষ্ট হইতে থাকে। ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে যে একটী পার্থক্যের অধিকার দিয়াছেন, তাহা উত্তরোত্তর পাকা হইতে থাকে। ছেলেবেলায় যে সকল প্রভেদ অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায়, বড় বয়সে তাহা পারা যায় না।

কিন্তু এই পার্থক্য জিনিষটা যে কেবল পরস্পরকে প্রতিরোধ করি-বার জন্য, তাহা নহে, ইহা ধাতুপাত্রের মত। ইহার সীমাবদ্ধতা দ্বারাই আমরা যাহা পাই, তাহাই গ্রহণ করি, তাহা আপনার করি, তাহা রক্ষা করি। ইহার কাঠিন্য দ্বারা আমরা যাহা পাই, তাহাই ধারণ

করি। যখন আমরা ছোট থাকি, তখন নিখিল আমাদিগকে ধারণ করে, এইজন্য সকলের সঙ্গেই আমাদের প্রায় সমান সম্বন্ধ।, তখন আমরা কিছুই ত্যাগ করি না। যাহাই কাছে আইসে, তাহারই সঙ্গে আমাদের সংস্রব ঘটে। বয়স হইলে আমরা বুঝি যে ত্যাগ করিতে না জানিলে গ্রহণ করা যায় না। যেখানে সমস্তই আমার কাছে আছে, সেখানে বস্তুত কিছুই আমার কাছে নাই; সমস্তের মধ্য হইতে আমরা যাহা বাছিয়া লই, তাহাই যথার্থ আমাদের। এই কারণে যে বয়সে আমাদের পার্থক্য দৃঢ় হয়, সেই বয়সেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়। তখন অবারিত কেহ আমাদের নিকট আসিয়া পড়িতে পারে না। আমরা যাহাকে বাছিয়া লই, আমরা যাহাকে আসিতে দিই, সেই আইসে; ইহাতে অভ্যাসের কোন হাত নাই। ইহা স্বয়ং আমাদের অন্তর প্রকৃতির মর্ম্ম।"

আবার বাল্যকালে যাহার সহিত পাঠশালায় মেশামিশি হয় নাই, যাহাকে "ভাই আমরা তোমার সহিত খেলিব না; তুমি মন্দ কথা কও; তুমি পেন্সিল না বলিয়া লও" ইত্যাদি ইত্যাদি অপ্রিয় সত্য বলা হইয়াছে, সেই বালক ধনী হইলে তাহার আরও দোষের কথা শুনিলেও আমরা যে অপ্রিয় ভয়ে তাহার প্রকৃত দোষ নির্দ্দেশ করিয়া দেখাই না, এমত নহে, অনেক সময় স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সে গুলি উপেক্ষা করিতেও সঙ্কুচিত হই না।

"কল্পনা-ক্ষেত্র হইতে সংসার-ক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেই অনেকের কাছে সঙ্কল্পের গৌরব চলিয়া যায়। প্রতিদিনের অল্পতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহারা বৃহৎকে, দূরকে, সমগ্রকে দেখিতে পায় না। প্রাত্যহিক চেষ্টার মধ্যে যে সমস্ত ভাঙ্গাচোরা জোড়াতাড়া বিরোধ বিকার সামঞ্জস্য অনিবার্য্য, তাহাতে পরিপূর্ণ পরিণামের মহত্ত্ব-ছবি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যে সকল কাজের শেষ ফলটীকে লাভ করা দূরে থাক, চক্ষেও দেখিবার

আশা করা যায় না, যাহার মানসী মূর্ত্তির সহিত কর্ম্মরূপের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করা, তাহার প্রতিদিনের স্তূপাকার বোঝা কাঁধে লইয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে চলা সহজ নহে। যাহারা উৎসাহের জন্য বাহিরের দিকে তাকায়, এ কাজ তাহাদের নহে। কাজও করিতে হইবে, নিজের শক্তিতে, তাহার বেতন ও যোগাইতে হইবে নিজের মনের ভিতর হইতে। নিজের মধ্যে এরূপ সহজ সম্পদের ভাণ্ডার সকলের নাই।”

“চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনং যৌবনং” একটী মহাজন-বাক্য। কৈশোরে বিনয়ী, পরদুঃখকাতর শিষ্টাচারীকে, যৌবনে প্রিয়ার সংসর্গে, অসামাজিক, দানকাতর, সাংসারিক শাসনে অশিষ্ট, বন্ধুপ্রীতি-বিনিময়ে রুদ্ধহৃদয় এবং সন্তান-লাভের পর বাৎসল্যপূর্ণও হইতে দেখা যায়। সেই ব্যক্তিরই পত্নী-বিয়োগান্তে দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করিয়া প্রথম পক্ষের সন্তানসন্ততিদিগের প্রতি বাৎসল্য-গোপন, পরে কাঠিন্য-প্রদর্শন, দ্বিতীয় পত্নীর কাম্যবস্তুসংগ্রাহার্থে সুখদুঃখকাতরতাকে কর্ত্তব্যের বিরোধজ্ঞান, ইত্যাদি প্রত্যহ দ্রষ্টব্য বিষয় বলা যাইতে পারে। কেহবা বিদেশে বড় চাকুরি পাইয়া গার্হস্থ্য শাসন উপেক্ষা করিয়া স্বার্থপ্রণোদিত ব্যক্তিদের প্ররোচনায় উচ্ছৃঙ্খলতার পরবশ হয়েন। কেহবা মহাগুরু-নিপাতের পর সংসারের কর্ত্তা হইয়া সংসার-শত্রুর করতলগত হয়েন।

এই ত গেল এক এক দশা-পরিবর্ত্তনের ফলের কথা। কিন্তু প্রত্যহ কোন নির্দ্ধারিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াও অনেকে চলেন না। প্রভাতে কঠিন হইয়া যিনি উপযুক্ত কর্ম্মচারী বাছিয়া লইয়াছেন, বৈকালে সেই কর্ম্মের অনুপযুক্ত, স্ত্রী-সম্পর্কে বা বন্ধু সম্বন্ধে আত্মীয়কে, সেই জাতীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে তিনি কুণ্ঠিত হয়েন না।

আবার কেহ ধীরে ধীরে বাধা বিপত্তি সত্বেও মহান্ লক্ষ্যের দিকে

অগ্রসর হইতেছে। বিদ্বান্ অথচ অসচ্চরিত্রের চরিত্র-হীনতা উপেক্ষা করিয়া কেবল তাহার বিদ্যা গ্রহণ করিতেছে। কেহবা মহাভারত শুনিয়া জ্ঞান, শৌর্য্যবীর্য্য, সহিষ্ণুতা, সাধুতা, "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ", ইত্যাদি শিক্ষা করিতেছে; কেহবা আত্মীয় দুঃখে কাতরতা, লোভশূন্যতা, দয়া দাক্ষিণ্য, সূচ্যগ্র ভূমিদান, ইত্যাদি সংসারের কাম্য সুখের কণ্টক বলিয়া বিবেচনা করিতেছে।

যে ব্যক্তি বাল্যাবধি সাধুসঙ্গপ্রিয় এবং শেষে ধর্ম্মপ্রাণ হয়েন, লোকে তাঁহাকে ভগবৎপ্রেরিত আদর্শ পুরুষ বলিয়া থাকে। কিন্তু এ জাতীয় ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব সংসারের পক্ষে কতদূর মঙ্গলময় তাহা বিচারাধীন। নিজ সংসার ও পরিচিত গণ্ডির মধ্যে সাধুসঙ্গ লাভ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। এ জগতে অসাধু প্রকৃতি লইয়া কেহই জন্ম-গ্রহণ করে নাই। যদি কেহ প্রতিবাদ করেন, তাহাকে অকাট্য প্রমাণ দর্শাইতে হইবে। নিজ সংসার ও পরিচিত গণ্ডির মধ্যে কি সাধু-সংসর্গ দুর্লভ? বালকে কি সারল্য, বালকতা, সত্য এবং অকপট উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না? বন্ধু বা কোন না কোন আত্মীয়ের নিকট কি উদারতা, আতিথেয়তা, সৎসাহস, আত্ম-বলিদান, পার্থক্য-হীনতা, দেখিতে পাওয়া যায় না? নিজের বা পরের নিকটও কি কোন একটী সদ্‌গুণ নাই; আমরা যদি বালক বালিকা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, অভ্যাগত অতিথি, শত্রু, মিত্র, ভৃত্য, গুরু, পুরোহিত, আচার্য্য ইত্যাদি প্রত্যেকের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সদ্‌গুণাদির সমষ্টি করিয়া, এই সমষ্টির অনু-করণ করি বা সংসর্গ লাভ করি, তাহা হইলে কি আমরা সাধুজন মধ্যে পরিগণিত হইতে পারি না? বংশগত দোষের যদি এতই প্রভাব, তাহা হইলে জগতে ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, সাহিত্যবীর ইত্যাদির প্রভব হইত না। প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু অবশ্য কল্পিত কথা, কিন্তু ব্যাসের পিতা যে ব্যাসের মত নহে, বুদ্ধদেবের পিতা যে শাক্য জাতির একজন

রাজা মাত্র, চৈতন্যের পিতা নবদ্বীপের একজন সামান্য ব্রাহ্মণ মাত্র, তাহা কে না জানে? আপন স্বাধীন প্রকৃতি লইয়া মানব জন্মগ্রহণ করিয়া আপন পরিচিত গণ্ডি ও মহাপুরুষের জীবনী হইতে, আপনাতে যে সকল গুণের সমাবেশ নাই, তাহারই আহরণ করিতে করিতে নিজেই গুণ-সমষ্টির আধার হইয়া উঠে। স্বার্থপর ঘরের ছেলে বাল্যাবধি উদার-চেতার গৃহে প্রতিপালিত হইলে উদার স্বভাব প্রাপ্ত হয়। ব্যাঘ্র-পালিত মনুষ্য-শিশু হিংস্রভাবাপন্ন হইয়া থাকে। আবার চণ্ডালের ঘরে প্রতিপালিত রামের মন-আকর্ষণে সক্ষম গুহকেরও অভাব নাই। মূলে হিতাহিত জ্ঞানের উদয় না হইলে শেষোক্ত ব্যক্তির বিকাশ সম্ভবপর হয় না। যাহার হিতাহিত জ্ঞান জন্মায় নাই, তাহাকে সৎসংসর্গের উপকারিতা ও অসৎ সংসর্গের অপকারিতা উপলব্ধি করাইতে চেষ্টা পাওয়া বৃথা।

এই হিতাহিত জ্ঞান কেবল সাধু সঙ্গে লাভ করা যায় না। সৎসঙ্গে হিত জ্ঞান হয়—কাশীবাস হয়—অর্থাৎ সংসারে থাকিয়াও অহিতাদি দোষে নির্লিপ্ত হইয়া বসবাস করা যায়। কিন্তু বিচক্ষণ সূক্ষ্ম-দর্শী ও নানা প্রকৃতিপন্নের, চতুর অথচ সদ্‌ব্যক্তির সংসর্গে হিতাহিত জ্ঞান জন্মায়। অহিতের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের চোখফোটানো তুলনায়, হিতের জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া সংসারের অন্ধকার দূরে চলিয়া যায়। এই তুলনায় জ্ঞানবৃদ্ধির সম্ভাবনা সংসারে বড় অল্প নহে; কিন্তু সেই জ্ঞানের আলোকে ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ আলোকিত করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা অতীব কঠিন কথা। সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু পথ অব-লম্বন করা বোধ হয় তত কঠিন নহে।

অজ্ঞ ও মূঢ় ব্যক্তি যেরূপ হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য না হইলেও বিজ্ঞান, সাহিত্যও অন্যান্য বিশেষ বিদ্যার বিচার করিতে অক্ষম, সেইরূপ শিক্ষিত

নিয়মের বশবর্ত্তী বা অবশবর্ত্তী

হওয়ার দোষ গুণ বিচার করিতে অসমর্থ। এই উভয়বিধ ব্যক্তির সমগ্র গুণের সংসর্গ, জীবনসংগ্রামে প্রতিষ্ঠালাভেচ্ছু ব্যক্তির পরিহার করা নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত। প্রথম শ্রেণীর লোকের নিকট নিজ গুণের সমালোচনা হওয়া অসম্ভব। শিক্ষিতের, বৈজ্ঞানিকের, সাহিত্যসেবীর দোষ গুণের বিচার না হইলে দোষের ভাগ সঙ্কোপিত হইয়া গুণের ভাগ বৰ্দ্ধিত হয় না। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কপট ধাৰ্ম্মিক, শিক্ষিত বিনয়ী, স্বার্থ সাধনে দানশীল, যাঁহারা কোন নির্দ্ধারিত নিয়মের বশবৰ্ত্তী নহেন, যাঁহারা অদ্য যে গুণের আদর করিতেছেন কল্য প্রয়োজন হইলে তাহার নিন্দা করিতেছেন, যাঁহারা রিক্তহস্ত অবস্থায় দান করিতে অক্ষম বলিয়া প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং অবস্থাপন্ন হইলে, দরিদ্রের আৰ্ত্তনাদে কর্ণপাত করেন না, তাঁহাদের অপকৃষ্ট গুণের সংসর্গে স্বার্থান্ধ ও কপট হইতে হয়, চক্ষু থাকিলেও দৃষ্টিহীন হইতে হয়, সৎসাহসে জলাঞ্জলি দিতে হয়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া বিবেকের বাণী ও সারল্য ভুলিয়া গিয়া দেশ, কালও পাত্র বিশেষরূপ সীমার মধ্যে কারাবাসী হইতে হয়।

এসংসারে একাধারে সমস্ত সদ্‌গুণ পরিলক্ষিত হয় না এবং সংসারীর যে সকল গুণ আবশ্যক, তাহারও সংখ্যা করা যায় না। প্রবাদ কথামত হংসের ন্যায় দুগ্ধের ক্ষীর ভাগ গ্রহণ করিয়া জলভাগ ত্যাগ করিতে হইবে। এ সংসারনাট্যশালায় কতবার যে পটপরিবৰ্ত্তন হইতেছে, তাহার গণনা করা যায় না। কখন মানব সুবর্ণ হরিণ-শিশুর ন্যায় রামের মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞের হৃদয়ও চঞ্চল করিয়া দিতেছে, কত শত রমণী রূপলাবণ্যপ্রভা ও চিত্তহারিকটাক্ষপাতে সদ্যোমথিতনবনীতবৎ সুকোমল চিত্তকে দ্রবীভূত করিয়া আপনার কঠিন আধারে আকর্ষণ পূর্ব্বক আধারবৎ গঠন দিতেছে—কত শত সূক্ষ্মদর্শী তার্কিক তর্ক-প্রপঞ্চে সারল্যের সুযোগ অন্বেষণ করিয়া আপন দলপুষ্ঠ করিতেছে—কত শত একদেশদর্শী পল্লবগ্রাহী কোন সাহিত্য বা

শাস্ত্রের বহুল সেবক না দেখিয়া, নিজ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট আত্মগরিম-বর্দ্ধনের সুযোগ প্রতীক্ষায় ব্যস্ত রহিয়াছে ও পরে গুণগ্রাহীকে আকর্ষণ করিয়া বিদ্যাদানে সংকীর্ণতা দেখাইতেছে—কত শত ব্যক্তি কামলার কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া শ্রমবিনিময়ে ধনাগম হয়, এ কথার স্বার্থকতা উপলব্ধি না করিয়া, শ্রমসহিষ্ণুর উদ্যম ও অধ্যবসায়ের মূল্য বুঝিতেছে না এবং অপরকেও বুঝিতে দিতেছে না—আবার কত শত কপট পরামর্শদাতা উল্লিখিত কুবেররপুত্রদিগকে করি কি না করি দ্বিধার মধ্যে আনয়ন করিয়া, বহিঃপ্রকৃতির রূপান্তর সাধনপূর্ব্বক অন্তর প্রকৃতিতে আকর্ষণ করিতেছে ও অতি সহজে তাহাদের ধনভাণ্ডারদ্বার মুক্ত করাইয়া আপনার ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে। অতএব যুবকগণের একটী লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বাধা বিঘ্ন পাইয়াও গোলোক-ধাঁধার মরীচিকায় থাকিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বন্ধু বান্ধব, শত্রু মিত্র, শ্রদ্ধেয় বা ভৃত্য, আত্মীয় স্বজন, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, যাহার নিকট সারল্য বালকতা, উদারতা, আতিথেয়তা, অভিনিবেশ, অধ্যবসায়, ধর্ম্মমতি; সৎসাহস, ইত্যাদি যে গুণ পাইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। যদি জীবনে নিশ্চিত পণ করা যায় যে, আমি গুণগ্রাহী হইব, তাহা হইলেই সৎসঙ্গ লাভ করা হয়। গুণের ভিক্ষারী হইয়া যাহাতে ভিক্ষার ঝুলি ভিন্ন ভিন্ন গুণসমষ্টির আধার হয় ও পরে উহা পরিপূর্ণ হয়, তাহাই প্রধান লক্ষ্য করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইলে চলে না। যেহেতু গুণগ্রাহী হওয়া অপেক্ষা গুণবান হওয়া মানসিক বলসাপেক্ষ। উদ্যম-বিহীনের শ্রম-বিনিময়ে যে সামগ্রী সঞ্চিত হয়, উহা ক্ষণকাল স্থায়ী। হল চালনা করিয়া সম্বৎসরের কর্ম্মফলে কৃষক যাহা লাভ করে, উহাও বর্ষকাল মাত্র স্থায়ী। বিচক্ষণ কর্ম্মকর্ত্তা উৎপন্ন সামগ্রী হইতে শ্রমবিভাগে মূলধন প্রয়োগ করিয়া যে বিনিময়সাধ্য পণ্য সামগ্রী প্রস্তুত করান, তাহাও অধিকারী হইতে বিচ্যুত না হইলে তাঁহার ধনাগম হয় না। বাস্তব

সামগ্রীর বিনিময়ে যে ধনাগম হয়, শ্রমই তাহার একটী মূলীভূত কারণ। ভিক্ষুক শ্রম-বিনিময়ে তাহার ভিক্ষা প্রাপ্ত হয় না, চৌর্য্য-বৃত্তিতে লব্ধ ধনও শ্রম-বিনিময়ের ফল নহে। গুণের কথা স্বতন্ত্র। ইহা বাস্তব সম্পত্তি নহে। মানসিক শ্রমলব্ধ গুণের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করিলেও বিনিময়-কালে বাস্তব ধনের মত মানবগুণসম্পত্তি অধিকারী হইতে বিচ্যুত হয় না। ইহা অমূল্যধন, ইহা চোরে লইতে পারে না, ইহা "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।" মানসিক শ্রমের ফলে এক একটী গুণের অধিকারী হইয়া তত্তদ্‌গুণের প্রভাবে অপরাপর গুণের সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু লাভের প্রত্যাশায় যেমন পণ্যজীবীকে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, সেইরূপ গুণগ্রাহীকে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে অনেক সংসর্গ এড়াইতে হয়। গুণবানের ধূমপান বা সুরাপান বা অকথ্য কথনের সময় নিজ লক্ষ্যের মহচ্ছবির দিকে একতানমনা হইবে ও সুবিধা পাইলেই তাহার গুণভাগ গ্রহণ করিতে হইবে। নাস্তিকের নিরীশ্বরবাদ তর্ক-কালে আস্তিকের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কপটতার জালে পড়িলে সারল্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। পাপের প্রভাব বিস্তার দেখিলে পুণ্যের অনুসন্ধান করিবে। পল্লবগ্রাহী একদেশদর্শীর আত্মগরিম-বিস্তারের প্রয়াস দেখিলে পণ্ডিতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। শ্রমবিনিময়ে বা শ্রমোৎপন্ন সামগ্রী-বিনিময়ে অপরের সামগ্রী পাইবার বাসনা বলবতী না হইয়া, অনায়াসে উহা অধিকারীকে না বলিয়া বা অনধিকার বলপ্রয়োগে উহা পাইবার বাসনা, মনোমধ্যে উদ্দীপিত হইলে যাহারা শ্রমের বিনিময়ে সামগ্রী লাভ করে, তাহাদের সংসর্গ অনুসন্ধান করিবে।

সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ।

মনুষ্য সামাজিক জীব। পরস্পরের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত মানবকে কতকগুলি নিয়মের অধীন হইয়া অনেকের সহিত একত্র বাস করিতে হয়। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বনিতা, নন্দন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু ও সুহৃৎ—অবস্থাভেদে, প্রয়োজন বিশেষে, এইরূপ পাত্রগণের সহিত কালযাপন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপ একত্র কালযাপনকে সঙ্গ বলা যায়। সঙ্গ সমাজের একটী প্রধান অঙ্গ; কারণ ইহার উপর মানবের মঙ্গলামঙ্গল অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। সৎ সঙ্গে মঙ্গল এবং অসৎসঙ্গে অমঙ্গল সাধিত হয়।

সদ্‌গ্রন্থ একটী প্রধান সৎসঙ্গ। ভাগ্যের তরঙ্গে বাহিত হইয়া মানব যে কোন অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, একখানি সদ্‌গ্রন্থ তাহার নিকট থাকিলে শত শত সদ্বন্ধুর সাহায্যসুখ সে সর্ব্বদা সম্ভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু সদ্‌গ্রন্থ কাহাকে বলে? আজিকালি বঙ্গদেশ উপন্যাস, নাটক ও গল্পের আবিল স্রোতে নিমগ্ন হইয়াছে। অজাতশ্মশ্রু বালকগণ বিদ্যালয়ের নিত্য নিয়মিত পাঠ্য পুস্তক উপেক্ষা করিয়া অকিঞ্চিৎকর নাটক নবন্যাসে সময় বঞ্চনা করে, তাহাতে পরিণামে তাহারা আপনারাই বঞ্চিত হয়। যে গ্রন্থপাঠে মানবের অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণের আধিক্য ঘটে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণপ্রধান তুচ্ছ বিলাস-লালসা নিরস্ত হইতে থাকে, সেই সকল গ্রন্থকেই সদ্‌গ্রন্থ বলা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, মহাজন-চরিত প্রভৃতি পুস্তক সদ্‌গ্রন্থ নামে অভিহিত হইতে পারে।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে গ্রন্থসকল চিরস্থায়ী ও অচিরস্থায়ী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। চিরস্থায়ী গ্রন্থ নিত্য ও শাশ্বত। তাহার কোন কালেই বিনাশ নাই; কখনই তাহার প্রভাব হ্রাস পায় না এবং কোন কালেই তাহার গুণ বিনষ্ট হয় না।

কিন্তু অচিরস্থায়ী পুস্তক ঠিক ইহার বিপরীত। তাহার প্রভাব সাময়িক, তাহার প্রয়োজনীয়তা ক্ষণব্যাপিনী। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সদ্‌গ্রন্থ হইলেই চিরস্থায়ী হয় না, অসদ্‌গ্রন্থেরও প্রভাব চিরকাল স্থায়ী হইতে পারে। সুতরাং সদ্‌গ্রন্থ ও অসদ্‌গ্রন্থ উভয়ই চিরস্থায়ী ও অচির-স্থায়ী হইতে দেখা যায়। উভয় প্রকার গ্রন্থের পার্থক্য এস্থলে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

প্রথমে সাময়িক বা অচিরস্থায়ী সদ্‌গ্রন্থের কথা বলা যাইতেছে। ইহা পাঠ করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে এবং যতক্ষণ ইহা পাঠ করা যায়, ততক্ষণ ইহার শক্তি সামর্থ্যে তোমার চিত্ত সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া থাকে। যাঁহাদের সহিত প্রত্যক্ষ আলাপ-পরিচয়ের সম্ভাবনা নাই, তাঁহাদের কোন মনোরম বাক্য পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে তাহাই সাময়িক সদ্‌গ্রন্থ নামে বর্ণিত হইতে পারে। মনোহর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, চিত্তাকর্ষক নবন্যাস বা গল্পমালা, সত্য ঘটনার জলন্ত বিবরণ,—এই সকল গ্রন্থ সাময়িক সদ্‌গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া যদি এগুলিকে প্রকৃত অর্থাৎ শাশ্বত সদ্‌গ্রন্থ বলা যায়, এবং প্রকৃত সদ্‌গ্রন্থ উপেক্ষা করিয়া যদি আমরা এই সকল আপাতমনোহর গ্রন্থপাঠে সময়ক্ষেপ করি, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

বন্ধুর পত্র চিত্তহারী বা প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহার মনোহারিণী শক্তি অচিরস্থায়িনী—যতক্ষণ পাঠ করিবে, ততক্ষণ তাহার প্রয়োজনীয়তা। ইচ্ছা করিলে তাহার সংরক্ষা করিতে পার, অন্যথা তাহা পরিত্যাজ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে একটী নূতন বিষয় পাঠ্য-রূপে ভারতবাসীর চিত্ত অধিকার করিয়াছে। তাহা সংবাদপত্র। ইং-রাজেরা কেবল প্রাতরাশের সময়েই ইহা পাঠ করে এবং ইহার সৌন্দর্য্য বা শক্তিসামর্থ্যের আলোচনা করিয়া থাকেন। অন্য সময়ে ইহাতে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপও করেন না। কারণ তাঁহারা জানেন, ইহার ফল

অচিরস্থায়ী, সেইজন্য ইহা সাময়িক পাঠ্যরূপে ব্যবহার্য্য। অতএব সংবাদ পত্র, নবন্যাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, এবং এই প্রকার অন্যান্য গ্রন্থ সাময়িক সদ্‌গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলিকে প্রকৃত গ্রন্থ বলা যায় না। কারণ গ্রন্থের ফল স্থায়ী; গ্রন্থের শক্তিসামর্থ্য অবিনশ্বর। যাহা প্রকৃত সুফলপ্রদ, ও প্রয়োজনীয়, যাহার সৌন্দর্য্য স্থায়ী সুফলের উৎপাদক বলিয়া গ্রন্থকার বিবেচনা করেন, তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার বিশ্বাস সে কথা আর কেহ কখনও বলে নাই; তাঁহার ধারণা এই যে, আর কেহ আর কখনও সেরূপ কথা বলিতে পারিবে না। তাঁহার এই ধারণা ও বিশ্বাস ভ্রান্ত, কি অভ্রান্ত, কাল তাহার বিচার করিবে। কিন্তু এই বিশ্বাস ধ্রুবতারার ন্যায় তাঁহার প্রধান লক্ষ্যরূপে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। প্রাণান্তেও তাহার বিলোপ হইবে না।

সৌজন্য।

এথেন্স নগরের এক বিরাট্ সভায় কোন বৃদ্ধ সভ্যের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। সেই সভায় দুইটী সম্প্রদায় ছিল, একটী এথেন্সবাসীর, অপরটী স্পার্টানগরের অধিবাসিগণের। সভাস্থ এথেন্সবাসী যুবকগণ আকার ইঙ্গিতে বৃদ্ধের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসিবার স্থান দিবার অভিপ্রায় জানাইল, কিন্তু বৃদ্ধ অতি কষ্টে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইলে তাহারা এরূপ কাছাকাছি হইয়া বসিল যে, তাঁহার স্থানলাভ একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িল। পরে বৃদ্ধ যখন সভাস্থ স্পার্টাবাসীদের সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহারা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিল, এবং বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। স্পার্টাবাসীদের এই

ব্যবহারে এথেন্সবাসীদের হৃদয়-বীণা যেন হঠাৎ বাজিয়া উঠিল এবং নিজেদের সঙ্কীর্ণতার ম্লানছবি যেন তাহাদের সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, তাহারা সমস্বরে উহাদিগকে অভিবাদন করিল। বৃদ্ধ কিন্তু উঠিয়া বলিলেন, এথেন্সবাসীরা ভদ্রতা কি তাহা জানেন, কিন্তু স্পার্টাবাসীরা ভদ্র ব্যবহার করিতে জানেন। প্রকৃত পক্ষে "আমার প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা হয় নাই" ইহা অনেকেই অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু নিজে ভদ্র ব্যবহার করিলেন কিনা অনেকে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে অক্ষম, অথবা কল্পিত কারণে তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না।

মানবের আচার ব্যবহার, চালচলন, ধরণ ধারণ কতকটা তাহার অন্তঃপ্রকৃতির বাহ্য বিকাশ বলা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা তাহার রুচি, পরদুঃখে বা সুখে নিজের মত করিয়া তাহার অনুভব করিবার শক্তি এবং তাহার মেজাজের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই সংসার-ক্ষেত্রে ক্রিয়া-কলাপ বা কর্ম্ম-সূত্রে, যে সকল লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়, তাহাদের সকলকে আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ করিয়া কার্য্য সাধন করিতে পারিলে জগতের সুখপ্রবাহ সমভাবেই চলিতে থাকে। এ জগতে রাজরাজেশ্বর ভিন্ন সকল লোকেরই সমানাবস্থ ও উপরিতন ব্যক্তি বর্ত্তমান; এবং অধীন ব্যক্তিইবা কাহার নাই? জগদীশ্বর যেরূপ সকল ব্যক্তিকে সমভাবে সূর্য্যরশ্মি ও বৃষ্টি দান করেন, সেরূপ কিন্তু সমভাবে ধনের বা সম্পদের অধিকারী হইতে দেন না। এই জন্যই এ জগতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোক পরিদৃষ্ট হয় এবং এই অবস্থার বিভিন্নতাই বোধ হয় মানব মাত্রকে সৌজন্যের আবশ্যকতা অনুভব করিতে দেয়। উপরিতন ব্যক্তির প্রতি সৌজন্য-প্রদর্শন ও অভিবাদন করা বড় বেশী কথা নহে; কিন্তু তাঁহার নিকট যেরূপ সৌজন্য প্রত্যাশা করা যায়, তাহা সকল সময় প্রদর্শিত হয় কিনা সন্দেহ। উপরিতনেরও উপরিতন আছেন এবং অধীনের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিলে যে তাহা

দ্বারা আরও অধিক মন দিয়া প্রাণ দিয়া কর্ম্ম সম্পাদন সম্ভবপর, এ কথা অনেকে ভুলিয়া যান। 'বাপু' ,বাছা' বলিয়া যে পরিমাণ কর্ম্ম পাওয়া যায়, কঠোর শাসনে তাহার অধিক পাওয়া যায় না, এ কথা শ্রুত থাকিলেও উচ্চ-পদ-গর্ব্ব-মত্ততা অনেক সময় এ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে দেয় না। অথবা হৃদয়ঙ্গম হইলেও তাহাদের এই আশঙ্কা হয় যে অধীনের নিকট সৌজন্য প্রকাশ করিলে বুঝিবা তাহাদের পদমর্য্যাদার অবমাননা হইবে। তাঁহার "সযত্নে ওজন করা বিন্দু বিন্দু কৃপা" দান করিতে করিতে স্বতঃই মনে হয় বুঝিবা কৃপার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইবে, অথবা দিন দিন বুঝি তাহার পদগৌরব নিম্নতম সীমায় অবনমিত হইবে। বাস্তব সম্পত্তির মত সৌজন্য-বিতরণে দাতার এ মহান্ গুণ-সম্পত্তি হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর উহার প্রভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে—উহার কিরণচ্ছটায় তাঁহার জগৎ উচ্ছ্বাসিত হইয়া যায়। রাজ-রাজেশ্বরও সৌজন্য-গুণে বঞ্চিত হইবেন না বলিয়া নহুষ ইত্যাদি রাজার বিড়ম্বনা কথা পুরাকালে কল্পিত হইয়াছে। কথিত আছে, চতুর্দ্দশ ক্লিমেণ্ট যখন পোপ হইয়াছিলেন, তখন বৈদেশিক দূতগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি প্রত্যেককে উহা প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এরূপ প্রত্যর্পণ যে পদ্ধতি-বিরুদ্ধ, তাহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করায় তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন যে, "অধিক দিন পোপ হই নাই বলিয়া সৌজন্য ভুলিতে পারি নাই। জর্জ ওয়াসিংটন্‌কে একটি নিগ্রো বালক টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিয়াছিল, তিনিও বিনয় সহকারে টুপি খুলিয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। কোন বন্ধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, সৌজন্য প্রকাশে তিনি কাহারও নিকট পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

সৌজন্য-প্রকাশের নিমিত্ত শিক্ষিত বিনয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহা অনেক সময় কপটতা বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। মিশ্রির ছুরি

দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি সুদুরপরাহত হইয়া থাকে। যাহারা মুখে একপ্রকার এবং অন্তরে অন্য প্রকার, তাহাদিগকে সকলেই সন্দেহ করিয়া থাকেন। তাহারা শিক্ষিত বিনয়ে যে কল্পিত সৌহার্দ্দ প্রকাশ করে, উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অনেক ভ্রান্ত সংসারাভিজ্ঞকে প্রতারিত হইতে হয়। যাহারা চেষ্টা করিয়া সাধু ভাব ধারণ করিতে পারে, তাহাদের অসাধু হইতে সুযোগের অসম্ভাব হয় না।

এরূপ অনেক ফল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার বাহ্য আবরণ কঠিন, অথচ ভিতর কোমল। মনুষ্যের মধ্যে অনেকে এরূপ আছে, যাহাদের বাহ্য প্রকৃতি দেখিলে মনে হয় বুঝি ভিতরেও তাহারা কঠিন; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা সেরূপ নহেন। তাঁহাদের অনেকে মনে করেন যে, সৌজন্য প্রকাশ করা কেবল পরকে সন্তুষ্ট করা মাত্র এবং পরকে সন্তুষ্ট করিতে হইলেই কেবল তাহাদেরই বিষয় ভাবিতে হইবে এবং নিজের মূল কথা বিস্মৃত হইতে হইবে।

প্রকৃত পক্ষে যাঁহারা আন্তরিকতায় অথবা হৃদয়াংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহারা যদি সৌজন্য প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার জগৎ এবং তাঁহার সংস্পর্শে যাঁহারা আইসেন তাঁহাদের জগৎ, কি মধুময় হয়। সাংসারিক কর্ম্মসফলতা যে তাহার অঙ্কশায়িনী হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? অপরের মনপ্রাণ যাদুকরের মত আকর্ষণ করিয়া তিনি সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী করিয়া লইতে পারিবেন। তাঁহাতে ভক্তি স্নেহ, প্রীতি, ও আন্তরিকতার যতই বিকাশ হইতে থাকিবে, ততই দূরস্থ হৃদয় নিকটস্থ হইবে এবং উহাদের অপ্রতিম বিকাশে কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি বন্ধু সকলেই হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া তাঁহাকে বলিবে—

"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এস ওগো এস, মোর হৃদয়-নীরে।" *

যে সৌজন্যগুণে পরের হৃদয়-কপাট উদ্ঘাটিত হয়, তাহা অতীব

* হৃদয়-যমুনা। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

দুর্লভ। এই অমিয় গুণে বিভূষিত হইয়া মানব-মন সুধারসে আপ্লুত হয় এবং তাঁহার সংসর্গে যাঁহারা আইসেন, তাঁহারাও সুধাস্বাদ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়েন। কিন্তু যে সৌজন্য ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সৌজন্যগুণে গুরুজন ও বৃদ্ধ, সমান অবস্থার ব্যক্তি ও নীচজন সকলেই প্রীত হইতে পারেন, তাহারও অভাব পরিদৃশ্যমান হয় কেন? দেশ কাল পাত্র বিশেষে যে সৌজন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে, সে বিষয়ের অনবধানতা বশতঃই সংসারে কত লোকের মনে যে কত কষ্ট হয়, এবং তাহার যে কি বিষময় ফল, এক এক সময় অনুভব করিতে হয়, তাহা হৃদয়িক ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।

রাষ্ট্র মধ্যে যেমন রাজা রক্ষা করিয়া থাকেন ও প্রজা তাঁহার বাধ্য হয়, সভ্য সমাজেও সেইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রতি সৌজন্য দেখাইয়া থাকেন, এবং পরস্পরের জন্য কিছু কিছু ত্যাগ-স্বীকার করিয়া থাকেন। মহানগরীর রাজপথে যখন যাতায়াতে লোকে লোকারণ্য হয়, তখন মনে হয় বুঝি কেহই পথ করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে না; কিন্তু সকলেই চলিয়া যান। যিনি যেভাবে ইচ্ছা, যদি সেই ভাবে তিনি যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেই বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, একের সহিত অপরের সংঘর্ষণ অনিবার্য্য হয় এবং অচিরে পথ বন্ধ হইয়া যায়। পরস্পরের কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকারে কিন্তু সেরূপ কিছু ঘটিতে পায় না। ভিড় দেখিলে যাহার কোমরে হাত ছিল তিনি উহা ঝুলাইয়া রাখেন, যাহার মাথায় ছাতি তিনি উহা মুড়িয়া ফেলেন এবং যিনি সোজা হইয়া চলিতে ছিলেন তিনি একটু কাত হইয়া পাশ দিয়া চলিয়া যান। এইরূপে অপরিচিতের মধ্যে প্রত্যহ ত্যাগ-স্বীকার করিতে শিক্ষা করিয়াও আমরা অনেক সময় উহার অভাবে পরিচিত গণ্ডির মধ্যে হাস্যাস্পদ হইয়া থাকি।

নিজ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত উপরিতন ব্যক্তির প্রতি সৌজন্য প্রকাশ

করিতে পশ্চাৎপদ না হইলেও আমরা হয় বিদ্যা না হয় পদ-গৌরবে অনেক সময় সামাজিক হিসাবে বৃদ্ধ ও গুরুজনের সম্মাননায় বীতস্পৃহ হই। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে আমরা অনেক সময় বুঝিতে পারি না যে, সে দিন কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, সকলেই সমান। ধনী ব্যক্তি ধনীর সহিত অশ্বযানাদি সম্পত্তি ক্রয়ের কথায় নিযুক্ত, বিদ্বান্ বিদ্বানের সহিত বিদ্যা-কথায় প্রবৃত্ত, অথবা মসিজীবী মসিজীবীর সহিত কর্ম্মস্থানের কথায় নিযুক্ত থাকেন। বাস্তবিক যে প্রসঙ্গ অনেকের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে, সে কথায় লিপ্ত থাকিলে অনেকে সকপোল-কল্পিত পদমর্য্যাদার হ্রাস বিবেচনা করেন, ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। কিন্তু ঐ দিনে সকলেই সমান ভাবিয়া এবং কাহারও নিকট ভীত হইবার কারণ নাই জানিয়া অশিষ্টাচারে প্রবৃত্ত হওয়া কখনই অনুমোদিত হইতে পারে না। এ সময়েও স্বকীয় সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনাকে নীচ হইতে দেওয়া কখনই সম্মত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আত্ম সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ত্তব্যের অনুধাবন-চিন্তা কম বেশী হইলেও উহা কখন একেবারে দূরে অবস্থিত হইতে পারে না। এই সকল অবস্থায় যদিও ব্যক্তিগত পদমর্য্যাদার কোনও পৃথক সম্মাননা আশা করিবার অধিকার নাই, তথাপি সৌজন্য-প্রাপ্তি সম্বন্ধে অযথা বাধা পাইবারও কোন কারণ দেখা যায় না। কোন লোক এ সময় যতই কেন মূর্খের মত কথা বলুন না কেন, তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করাও তাঁহার প্রতি অনাদর প্রদর্শন করা বোধ হয় অধিকতর মূর্খতা। আহার করিতে বসিয়া অবস্থা-ভেদে পৃথগাসন-লাভেচ্ছা, অপরাপেক্ষা অধিকতর উত্তম সামগ্রীর ভোগ-বাসনা, অথবা অপরকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বয়ং অন্য স্থানে বসিয়া উৎকৃষ্টতর সামগ্রী ভোজন, অভদ্রতা-পরিচায়ক। যদি নিজে অপরকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করা যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও নিজ

পর্য্যায়ক্রমে তাহা ভক্ষণ না করিয়া অনুরোধকারীর পাতে দিতে অভিলাষ প্রকাশ করিবেন।

আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে যাহার হঠাৎ অবস্থা মন্দ হইয়া যায়, তাহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌজন্য প্রকাশ করা উচিত। দরিদ্র পুত্রকে তাহার মাতা অন্য পুত্র অপেক্ষা অধিক যত্ন করেন। লজ্জার মাথা খাইয়া যখন দরিদ্র আত্মীয় বা আত্মীয়া আমাদের নিকট আসিয়া কিছু যাচ্ঞা করে, তখন মনে বুঝিতেই হইবে যে তাহার অবস্থা অতীব শোচনীয় এবং তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া আমাদের নিকট আসিতে সে কতবার দ্বিধা করিয়াছে। যদি এ অবস্থায় কখনও দান করিতে হয়, তাহা হইলে উহা গোপনে করা উচিত, নচেৎ প্রকাশ্যে দান করিলে অথবা দানের সময় অবজ্ঞা জানাইলে কেবল যে অভদ্রতা প্রকাশ করা হয় এরূপ নহে, নিতান্ত হতভাগ্য ও দাতার যে অপ্রতিম সুখলাভ হইতে পারিত উহা হইতে উভয়কেই বঞ্চিত হইতে হয়। ইহাতে জগতে একটা বাস্তব সামগ্রীর হস্তান্তর হইল বটে, কিন্তু তদনুষঙ্গী অভাবনীয় আনন্দ-ভোগ কাহারও ভাগ্যে জুটিল না। দাতা হৃদয়ের কোমলতর স্থানে অনুভব করিতে পারিল না :—

"দরিদ্রা বলিয়া তোরে আরো ভালবাসি।"

সৌজন্য-প্রকাশের আর একটি স্থান, যেখানে আমরা কোন প্রকারে প্রতারিত হইতে পারি না ভাবিয়াই অধিকতর বঞ্চিত হই—— ইহা আমাদের বন্ধু অথবা আমাদের নিম্নতন ব্যক্তিদের নিকট। ইহাদের নিকট কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের চলিতে হয় না ভাবিয়া আমাদের সামাজিক ও গৃহজীবন আন্তরিক সুখকর বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু তথাপি ব্যক্তি বিশেষের তত্তৎ কালীন মানসিক ও আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সামান্য অনাদর বা অযত্ন-প্রকাশে অনেক সময় অট্টহাসি গল্প গুজব হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। পরম বন্ধুদের

মধ্যেও বন্ধুজনোচিত সৌজন্য আবশ্যক, নচেৎ উহা বহুকাল স্থায়ী হয় না। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকেদেরও ভাল মন্দ দুই দিক বর্ত্তমান আছে এবং পারত পক্ষে মন্দ দিক অপ্রকাশ রাখিতে চেষ্টা করা সামাজিক হিসাবে অতীব সমীচীন।

ফল কথা বিদ্যাবিভবে, ঐশ্বর্য্যে বা অসাধারণ অবদান দ্বারা প্রশংসা লাভ করা সকলের কৃতিসাধ্য নহে এবং উহার অবসরও সর্ব্বদা উপস্থিত হয় না। কিন্তু অভিবাদন ও সাদর সম্ভাষণ, সবিনয় প্রীতিপ্রদর্শন, সপ্রণয় আমন্ত্রণ ও অনাময় জিজ্ঞাসা এবং সকলে যাহাতে নির্ভয়ে আলাপ করিতে পারে, এরূপ ভাব প্রকাশ দ্বারা পরের চিত্তরঞ্জন করা, বোধ হয় অনেকেরই সাধ্য। শিক্ষকের নিকট অথবা পুস্তক পাঠ করিয়া সৌজন্য শিখিতে হয় না। বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয় ব্যক্তির প্রতিও রূঢ়তা প্রদর্শন করা উচিত নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদিগকে একেবারে আকাশে তুলিয়া দিলে আপনার মানসম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টিহীন হইতে হয়। কাহারও পরামর্শ অনুমোদন করিতে হইলে নিজ মত প্রদর্শন করিয়া উহার যাথার্থ্য প্রমাণিত করিতে হয়; কারণ সৌজন্যের খাতিরে নিজ সঙ্কল্পের মহান্ ছবিকে ম্লান হইতে দেওয়া মূঢ়তা প্রকাশ করা মাত্র। যাহার প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিতে নিজের এবং অনেকের অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহাকে অতি মৃদু ভাবে প্রত্যাখ্যান করাই সৌজন্য। পশ্চিমের লোক দান করিতে অসমর্থ হইলে ভিক্ষুকের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে।

অসূয়া ও মাৎসর্য্য।

অসূয়া বলিলে কেবল পরের গুণের অনাদর করা বুঝায় না, পরের দোষ আবিষ্কার করাও বুঝাইয়া থাকে এবং পরের শুভ দেখিলে তাহার প্রতি দ্বেষ করা, অথবা পরের শ্রী দেখিয়া কাতর হওয়াকে মাৎসর্য্য

কহে। যেমন শনির দৃষ্টি বা বিষদৃষ্টি, সেইরূপ অসূয়ার দৃষ্টি অতি ভয়ানক। এই দৃষ্টিতে অতি সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মপরম্পরাও দুরভিসন্ধি-মূলক ও স্বার্থ-সাধক বলিয়া জুগুপ্সিত হয়। গুণহীন ব্যক্তি পরকে গুণবান দেখিলে হয় তাহার সমকক্ষ, অথবা তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, হইতে, কিংবা তাহার গুণের দোষ আবিষ্কার করিতে, চেষ্টা করে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আত্মোন্নতির দিকে ধাবিত হয়; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর লোক অপরকে নিম্ন সীমায় আনিয়া নিজের মত করিয়া লইতে সুখানুভব করে। কথামালায় কুকুরের মত অশ্বগণের আহারের স্থানে শয়ন করিয়া আপনিও আহার করিব না এবং আহার করিয়া যাহারা প্রাণধারণ করিবে, তাহাদিগকেও আহার করিতে দিব না অর্থাৎ নিজের শুভ হইবে না বলিয়া পরেরও যেন শুভ না হয়; এইরূপ মনোভাব অসূয়ার অপকৃষ্ট প্রকার বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় হীনতম অসূয়াগ্রস্ত ব্যক্তি দুর্দ্দমনীয় বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যে কেবল নিজের জন্য অসূয়া করে, এরূপ নহে তাহারা প্রকারান্তরে অপরের ক্ষতি করিতে উদ্যত হয়। ইহারা যে কেবল অপরের ক্ষতি করে, এরূপ নহে ইহারা কামনা করে যেন পৃথিবী হইতে সমস্ত গুণের প্রভাব, বিজ্ঞানের নবীন আলোক, ধর্ম্মের মোহিনীশক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া লয় প্রাপ্ত হউক। অসূয়া উচ্চাভিলাষ বা উন্নতির প্রসূ নহে। ইহা মানস-উদ্যানের আগাছা স্বরূপ। ইহা সৌধভেদী বট বৃক্ষের মত আপন আশ্রয়ের আপনি উচ্ছেদ করে। ঘৃণার কারণ অপসৃত হইলে যাহাকে ঘৃণা করা হইয়াছিল, তাহাকে আর ঘৃণা করিবার ইচ্ছা হয় না; কিন্তু অসূয়াগ্রস্ত ব্যক্তির মনের রোগ কোন চিকিৎসায় আরোগ্য হইবার নহে। ইহার এমনই প্রভাব যে, পরের উন্নতি অথবা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে শুনিয়া আনন্দপ্রকাশ না করিয়া তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় এবং মানব মাত্রের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে সাফল্য হইলে জগ-

-তের পক্ষে, দেশের পক্ষে ও সমাজের পক্ষে যে মঙ্গল হয়, এ চিন্তা মন হইতে দূরে অবস্থিত হইয়া তাহাদের ভ্রম এবং নিস্ফলতায় আনন্দপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়। কি অদ্ভুত ব্যাধি! কোথায় পরের সুখে সুখী এবং পরের দুঃখে দুংখী হইবে, না তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব! অহো! নিজের অনুপযুক্ততাই কি ইহার কারণ নহে? কিন্তু অনেকে ত অনুপযুক্ত আছে; কৈ সকলে ত অসূয়াগ্রস্ত নহে? অনুপযুক্ত ব্যক্তির উচ্চাভিলাষ-বোধ ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। উপযুক্ত ব্যক্তি কিন্তু অনুপযুক্তকে উচ্চপদে দেখিলে অনেক সময় অসূয়া করে। এরূপ অসূয়া অথবা মাৎসর্য্য অনেক সময় ন্যায় বিচার-প্রিয়তার অভিব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হয় সত্য, কিন্তু উচ্চ পদ যে কেবল উপযুক্ত ব্যক্তি মাত্রই লাভ করিতে সমর্থ হয় না, ইহার বহুল উদাহরণে মনকে অসূয়াগ্রস্ত না করিয়া অভিমান-পরবশ করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত। কারণ নিজেকে অপমানিত ও অনাদৃত বোধ করা এক বিষয় এবং অনুপযুক্ত হইলেও তাহার শ্রীবৃদ্ধিতে কাতর হওয়া অন্য বিষয়। আত্মগৌরবে মানব অপমান বা অনাদর বিস্মৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু অসূয়া-পরবশ হইলে আত্মোন্নতি সুদূর পরাহত হয়।

এজগতে অধিক লোক যদি আপনার ভাল ও পরের মন্দ দেখিতে বিশেষ ভাল না বাসিত, তাহা হইলে অসূয়া বা মাৎসর্য্য রিপুর প্রাবল্য দৃষ্ট হইত না। যাহাদিগের আপনার ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই, পরের ভাল দেখিলে তাহাদের অন্তরে ভীষণ দাবদাহ উপস্থিত হয়। এজন্য তাহারা পরের প্রাধান্য লঘুকরণার্থ অসূয়া-পরবশ হইয়া থাকে। যাহাদিগের আত্মচিন্তা নাই, কেবল পরসংক্রান্ত তাবৎবিষয়ের অনু-সন্ধানে অত্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ করে, তাহারা অনেক সময় অসূয়া পরবশ হয়, কারণ অপরের বিষয় জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক

ব্যক্তির নিজ বিষয়ে উন্নতি করিবার অবকাশ অতি অল্প। এই জাতীয় লোক পরের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য ক্রীড়াকৌতুকচ্ছলে অবলোকন করিয়া থাকে। পরের অপকারে স্বার্থ না থাকিলেও অসূয়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা তৎসাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং কৃতকার্য্য না হইতে পারিলেও অজানিত ভাবে স্বকীয় নীচতা ব্যক্ত করে। অন্তঃকরণের অন্যান্য বৃত্তির বিশ্রাম আছে অর্থাৎ কাল ও বিষয় অপেক্ষা করিয়া তৎসমুদায়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে; কিন্তু কাম ও অসূয়া সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকিয়া মন কলুষিত করিয়া রাখে। ইহার অস্থিরতায় ও চাঞ্চল্যে অসূয়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা কেবল স্বকীয় স্থানে থাকিয়া সুস্থির থাকিতে পারে না, অধিকন্তু বাটীর বাহিরে অপরের দোষান্বেষণে বহির্গত হইয়া সুখানুভব করে।

যেমন স্থিতিশীল রেলগাড়ীতে বসিয়া কোন গতিশীল রেলগাড়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন বিপরীত দিকে যাইতেছি; সেইরূপ যাহারা অভিজাত বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ এবং যাহাদিগের প্রাধান্য কুল-ক্রমাগত, তাহারা একজন কুলমর্য্যাদাশূন্য সামান্য ব্যক্তির অভ্যুদয় দেখিলে আপনাদিগের ক্ষয় মনে করে এবং অসূয়া-পরবশ হইতে প্রবৃত্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় অধীন অথবা কৃপার পাত্র, কিংবা অনু-গ্রহের ভিখারী যদি কখন অধ্যবসায় ও স্বকীয় চরিত্র-বলে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে বীতস্পৃহ হয়, অনুগ্রহকারীর তখনই মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন অনুকম্পার স্থানে অসূয়া আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করে।

যাহারা অনেক কষ্টে ও কুসৃষ্টি কল্পনায় কোন প্রকারে উচ্চপদ লাভ করে, তাহারা উপযুক্ত ব্যক্তির অক্লেশার্জ্জিত সম্পত্তি দেখিতে পারে না এবং পরকে স্বানুভূত ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিলে মনে মনে সন্তুষ্ট হয়। যাহারা নানাবিষয়ে অতিশয় লাভ করিতে চায়, অথবা নানা বিজ্ঞান বা শাস্ত্র আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের অধিকাংশ

লোকের কেবল পল্লবগ্রাহিতা মাত্র জন্মে এবং একৈক বিষয়ে অনেক ব্যক্তি অপেক্ষা ন্যূন থাকিয়া জিগীষা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয় না। সম্রাট্ এড্রিয়ানের চরিত্র এইরূপ ছিল। তাঁহার কবিত্ব, চিত্রকর্ম্ম ও স্থপতি বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভের নিমিত্ত স্পৃহা অতি বলবতী ছিল; সুতরাং ঐ সকল গুণের অধিকারীদিগকে তিনি অতিশয় অসূয়া করিতেন।

দেশ কাল পাত্র বিশেষে অসূয়ার তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। অতি সুপাত্র ব্যক্তির পদোন্নতি দেখিলে লোকে তত অসূয়া করে না; কিন্তু জ্ঞাতি অথবা সতীর্থগণের পদোন্নতি দেখিলে অসূয়া হয়; কেন না উহাতে আপনার ন্যূনতা সর্ব্বক্ষণই আপনার ও অন্যের নিকট নিবেদিত হয় এবং দশজনে ন্যূনতা জানিতে পারিলে অসূয়া দ্বিগুণতর হইয়া উঠে। তুলনা ব্যতীত অসূয়া জন্মে না; এ নিমিত্ত সমকক্ষ ব্যক্তিরাই অসূয়াস্পদ হয়। যে স্থলে দূর বৈষম্য প্রযুক্ত তারতম্য-জ্ঞান সুগম হইয়া উঠে না, তথায় অসূয়া দৃষ্ট হয় না। নরপতির শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে অন্য নরপতি ব্যতীত পৌরলোকের কখনই অসূয়া-সঞ্চার হয় না। ক্রমশঃ ও ধীর ভাবে যাহারা উন্নীত হয়েন, তাঁহাদের অপেক্ষা যে ব্যক্তি সহসা উন্নত হয়েন, তাঁহাকেই সমধিক অসূয়াবহ হইতে হয়, কেন না শেষস্থলে লোকে হঠাৎ নিজ ন্যূনতা অনুভব পূর্ব্বক সমধিক বেদনা বোধ করে; কিন্তু বাড়ীতে থাকিয়া ক্রমিক বর্দ্ধনশীল বালকের বৃদ্ধি যেমন অনুভব করা যায় না, সেইরূপ পূর্ব্বকথিত উন্নতি লোকের সহ্য হইয়া আইসে এবং কখনই কষ্টদায়ক হয় না। যাহারা অনেক দুঃখের পর বড় পদ প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে লোকে বড় একটা অসূয়া করে না, কেন না, তাঁহাদের প্রতি সকলেই বলিয়া থাকেন "আহা হউক, অনেক কষ্ট পাইয়াছে"। অসূয়া রোগের মহৌষধ অনুকম্পা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

SELF-CONCIET—SEEMING WISE.

আত্মাভিমান ও বিজ্ঞতার ভাণ।

অধিকাংশ মানব স্ব স্ব দোষ বা দুর্ব্বলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ। একজন যেমন অপরকে দেখে, তাহার কর্ম্মসামর্থ্য বা গুণাবলীর যেরূপ বিচার করে, অধিক সংখ্যক লোক আপনাকে সেরূপ ভাবিতে পারে না। অথবা আপনাকে অযথা অধিক বড় মনে করা যে উচিত নহে, এরূপ ধারণা করিতে অনিচ্ছুক। যদি তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন বা ইচ্ছুক হইতেন, তাহা হইলে অতৃপ্তির উৎকট অশান্তি বা লালসার লোলুপললন, বা বিরক্তির বিষময় বিদ্রোহ, কিংবা অভাবনীয় অভিভব ভাবনা মনোমধ্যে উত্থিত হইয়াই আপনি প্রশমিত হইত এবং মানবজগতে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-প্রবাহ সমভাবে পরিদৃশ্যমান হইত।

যে ব্যক্তি আপনাকে চিনিতে না পারিয়া আপনি বড় মনে করে এবং যে ব্যক্তি নিজ ক্ষমতা ও গুণ অবগত হইয়াও আপনার বড়াই করে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নির্গুণের সংসর্গ পছন্দ করে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি গুণী বা বিজ্ঞের ভাণ করিয়া তাহাদেরই কথাবার্ত্তা বা সভাসমিতিতে উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করে। পল্লিগ্রামে ইংরাজি-না-জানা লোকের নিকট অথবা যে সংসারে সরস্বতীর কৃপাকটাক্ষ পতিত হয় নাই, ইংরাজি ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াই অনেকে তথায় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতে থাকে। তাহার চালচলন ও আবৃত্তির ধরণ ধারণে গ্রামের লোকের তিষ্ঠান ভার হয়। বিজ্ঞম্মন্যের ধর্ম্ম কিন্তু স্বতন্ত্র। যেখানে পণ্ডিত, তথায় সে ব্যক্তি দুই একটি কথার আবৃত্তি করিয়া অথবা গম্ভীর ভাবে মৌনী থাকিয়া আপনাকে সর্ব্ববিষয়ে পণ্ডিত বলিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা করে। যুবা বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিলাভ করিলে যে আত্মশ্লাঘা হয়, আপনাকে আপনি চিনিতে না পারাই উহার কারণ ভিন্ন আর

কিছুই নহে; সেই ব্যক্তি যখন জ্ঞানী বা পণ্ডিত বা শ্রদ্ধাবান হয়েন, তখন তাহার সসীমবিদ্যার সীমা অনন্তে গিয়া লীন হয়; তখন বিনয় ও ব্রীড়া আসিয়া আত্মশ্লাঘার স্থানে একাধিপত্য বিস্তার করে। তখন তাহার স্বতঃই মহামতি নিউটনের (Newton) মত বলিতে ইচ্ছা হয়;— "আমি জ্ঞান-সমুদ্রের মধ্যে এখনও প্রবেশলাভ করিতে পারি নাই। বেলাভূমিতে মাত্র বালকের ন্যায় উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি।" তথন তাহারা আপনার বিচারশক্তির পর্য্যবেক্ষণদ্বারা স্বকীয় অজ্ঞানতা ও বুদ্ধি-হীনতা অনুভব করিতে ইচ্ছা করে এবং অপরে যে তাহাকে চক্ষু ফুটাইয়া উহা দেখাইয়া দিবে, এরূপ ভাবিতেও তাহাদের মনে যেন আঘাত লাগে। কিন্তু সকলের এরূপ মতিগতি হয় না। অধিকাংশ ব্যক্তিকে রীতিমত লাঞ্ছিত বা অপরকর্তৃক বিশেষভাবে পরিজ্ঞাপিত হইয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়, যে নিজের বিদ্যা বুদ্ধির অত্যধিক অহঙ্কার করা হইয়াছে। অনেকে আবার আপনার ভ্রম স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না বরং তাহারা মনে করে যে, তাহাদের কার্য্যসামর্থ্য ও গুণাবলী বিচার করিতে মানবজগৎ অভ্রান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছে। এই জাতীয় অবিচার জগতে প্রায় সং-ঘটিত হয় না। মূর্খের সভায় ইহার সম্ভাবনা থাকিলেও দুঃখিত হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না; যেহেতু পৌরুষ নিজ করায়ত্ত। অনাদৃত হইলে মনের বলে ক্রমিক উন্নতিপ্রয়াসে অভিমান দূরে চলিয়া যায় এবং আপনার পথ আপনি পরিষ্কৃত হয়। আপনাকে অযথা বড় মনে করিতে গেলে একপদ অগ্রসর হইতে না হইতে দুইপদ পশ্চাৎপদ হইতে হয় এবং পিছু হাঁটিতে আরম্ভ না করিলে আর অগ্রসর হইতে পারা যায় না। সম্ভ্রমের উপযুক্ত হওয়া নিজের আয়ত্ত, কিন্তু সম্ভ্রম প্রার্থনা করিতে হইলে উপযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

যুবকেরা বীণাপাণির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া অথবা জ্ঞানপথে কিয়দ্দূর গমন করিয়া, অথবা আত্মীয়দত্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া,

কিংবা কর্ম্ম করিতে করিতে উচ্চপদ লাভ করিয়া, আত্মশ্লাঘায় অভিভূত হয় এবং এইরূপে বিদ্বানের ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া, ধনীর দান ভুলিয়া গিয়া এবং পদের মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া জ্ঞানী না হইয়া বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় হইয়া থাকে। বিদ্যা বা ধন বা পদসম্মান যে বিজ্ঞাপনের বস্তু নহে, উহা আত্মোন্নতির সোপান, একথা তাহারা বিস্মৃত হয়। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, বহুমূল্য সামগ্রীভোগে যেমন ধননাশ হয়, উচ্চপদের অসদ্ব্যবহারে যেমন পদমাহাত্ম্য বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ বিদ্যা জাহির করিলেও কেবল পল্লবগ্রাহিতার পরিচয় দেওয়া হয়। মানবের বিদ্যা গুণরূপ সম্পত্তি, ইহা অল্প থাকিলেও দান করার পর অধিকারী এ সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হয়েন না। ইহার বড়াই করায় নীচতা প্রকাশ পায় মাত্র। কিন্তু ধনীর সম্পত্তির অত্যধিক ব্যয় হইতে হইতে যে অংশ ব্যয়িত হয়, উহা আর ফেরৎ আইসে না। ইহাতে যে পরে অহঙ্কার চূর্ণ হয় এরূপ নহে তাহার নিত্য নূতন "অভাবে স্বভাব নষ্ট" হয়। ক্রমিক অল্প বিত্তবান হইয়া অভাবের তীব্র কষাঘাতের যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে তাহারা পরকেও স্বানুভূত ক্লেশভোগ করিতে দেখিলে মনোমধ্যে আন্তরিক সুখভোগ করিতে থাকে। বিদ্যা জাহির করিতে গিয়া, অথবা ধনবত্তার পরিচয় দিতে গিয়া, কিংবা পদের প্রাধান্য বা প্রভুতা বিজ্ঞাপন করিতে গিয়া, তাহারা অনেক সময় অহঙ্কার রিপুর পরবশ হইয়াও মাৎসর্য্যরূপ অপর একটী রিপুর সেবা করিতে ইচ্ছা করে।

যাহারা অল্পবিদ্যা লাভ করিয়া বিজ্ঞ বা পণ্ডিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা আপনাকে উন্নত করিতে না পারিয়া বিজ্ঞতর পণ্ডিতগণকে স্বকীয় নিম্নতর সীমায় আনিতে ইচ্ছা করে, নচেৎ তাহাদিগের সমকক্ষ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। ইহাই বিজ্ঞতার ভাণ এবং বিজ্ঞব্রুবের লক্ষণ। কতকগুলি পুস্তকের সংগ্রহ মাত্র করিয়া—কতকগুলি পুস্তকের সমস্ত ভাগ গাঢ় অভিযোগ সহকারে অনুশীলন না করিয়া কেবল অংশতঃ

পাঠ করিয়া বা চোখ বুলাইয়া বা সূচী ও ভূমিকা পড়িয়া, কিংবা উহাদের সমালোচনা বা সমালোচনার সমালোচনা পাঠ করিয়া তাবৎ গ্রন্থকার বা শাস্ত্রজ্ঞদের নিকট স্বকীয় বিজ্ঞতার ভাণ করিতে উহাদের অনেকেরই সাধ হইয়া থাকে। আজি কালিকার এই সংবাদ পত্র ও এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার দিনে কোন বিষয় না জানিয়াও জানি না বলিতে লজ্জা বোধ হয়। কি অসম্ভব লজ্জা! চাণক্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন;—

"অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনং চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ।"

কিন্তু অজ্ঞের অজ্ঞতা গোপন করা যে কোন্ শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে, তাহা জানা যায় না। যে উপায় দ্বারা বিজ্ঞব্রুবেরা অজ্ঞতাকে গোপন করে, অবশ্যই উহাদের নিকট সে উপায় অজ্ঞতা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয়। উহারা অজ্ঞতা গোপন করায় স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় যে, অজ্ঞ বুঝি বিজ্ঞের শ্রদ্ধা করিতে সমুৎসুক; নচেৎ তাহারা স্বকীয় ধর্ম্মত্যাগ করিয়া বিজ্ঞতার ভাণ করিতে কেন এত যত্ন লইয়া থাকে? অসাধু ব্যক্তি যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে প্রণোদিত না হইয়া কেবল স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সাধুর ভেক ধারণ করে; সেইরূপ বিজ্ঞব্রুবেরা স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তই বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া থাকে। ধীশক্তি মার্জ্জিত করিবার নিমিত্ত ইহাদের বিদ্যা আয়ত্ত না হইয়া উপাধিলাভের নিমিত্ত পুথিতেই থাকিয়া যায়। ইহারা আপনার স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত। ইহারা তালিকাকারে পরের মত নিজের বলিয়া জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করে; ইহারা সৌরভহীন কৃত্রিম পুষ্পের মত শোভা পায়; ইহারা উদ্যানস্থ পরগাছার ন্যায় যে বৃক্ষ আশ্রয় করে, তাহাকে ফললাভে বঞ্চিত করিয়া আপনাকে বর্দ্ধিত করিয়া লয়। ইহারা এরূপ শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইয়া কথাবার্ত্তা কহে এবং এরূপ আকার ইঙ্গিত সম্বরণ বা সংসৃষ্টি করিয়া চলে যে মনে হয় যেন তাহারা কতই গুরুতর রহস্য অবগত

আছে। ইহারা তর্কে পরাজিত হইলেও হারি মানিতে চাহে না, অথবা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া লম্বা চওড়া কথায় অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে। যাহা ইহাদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই এবং যাহা বুঝিবার প্রয়োজনও নাই, ইহারা তাহার সমর্থন করিবার চেষ্টা করে এবং অনেক স্থলে মৌনাবলম্বন করিয়া বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া থাকে। যখন ইহারা দেখে যে, প্রতিপক্ষের যুক্তি সকল খণ্ডন করিবার উপায় নাই, তখন একটি বাক্‌ছল ধরিয়া উহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে। এ জাতীয় লোক কোন বিষয় প্রস্তাব করিবার সময় নানা আপত্তি উপস্থাপিত করে, বিবিধ ভাবী বিঘ্নের ভয় দেখায় এবং প্রায় নিষেধ-পক্ষেরই পক্ষপাতী হয়; কেন না নিষেধ পক্ষের সমর্থনে কৃতকার্য্য হইলে বাদানুবাদ একেবারেই মিটিয়া যায়। এরূপ লোককে কখন কোন কার্য্যের ভারার্পণ করা বিধেয় নহে। বরং অজ্ঞ হওয়া ভাল, কেন না তাহার নিকট প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

পল্লীজীবন ও নগরজীবন।

পল্লীজীবন বলিলে আমাদের মনে কত সুখস্মৃতি-বিজড়িত অতীতের কথা জাগিয়া উঠে। এখনও তথাকার—

> "কোকিল-কাকুলি-মধু,
> পাপিয়া-মদির-তান,
> হরিৎপ্রান্তরকোলে,
> তটিনীর কলগান";
> রাখাল-মুরলীধ্বনি,
> ধেনুবৎসপক্ষীরব,

কি মধুর—কি সুন্দর !
কেমনে ভুলিব সব ?
গৃহস্থের সন্ধ্যাদীপ,
তুলসীবেদীকামূলে,
শঙ্খধ্বনি—কি মধুর !
কেমনে যাইব ভুলে ?

পল্লীজীবন বলিতে এখনও আমাদের মানস-পটে সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির "শ্যামাঙ্গিনী হৃদয়ের মধ্যমণি" প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রের স্নিগ্ধচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। পূর্ব্বেকার ভগ্ন-চূড়প্রসাদ, মন্দির ও অতিথিশালার স্বত্বাধিকারীর ব্যবহারে তাহাদিগের পরোপকার-প্রবৃত্তি, অকপট আত্মীয়তা এবং সমাজশাসনের কঠোরতার এখনও পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও মনে হয় যেন একটী বড় গৃহস্থালীর পরিবারভুক্ত হইয়া পল্লীর অধিবাসিবৃন্দেরা "এক জননীর কোলে সোদর সন্তান মত" বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে; এখনও তাহারা ইচ্ছা করে যেন কোন কোন ধনী ও বিজ্ঞ গ্রামের লোক তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য আন্তরিক উদ্যম প্রদর্শন করে, এবং তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে বালকের ন্যায়, ভক্তের ন্যায়, পুত্রের ন্যায়, তাঁহাদের পরিণত মতের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদিগের সারল্য ও অন্যান্য আভরণ অর্থের সহিত বিনিময় করিতে তাহারা এখনও পশ্চাৎপদ। এখনও অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ গৃহে আগমন করিলে, তিনি নীচ বর্ণের হইলেও সর্ব্বময় দেবতা জ্ঞানে তাহার সেবা করিতে তাহারা আগ্রহান্বিত। এখনও সরলা বালিকা পল্লী-গৃহিণীর পদানুসরণ পূর্ব্বক অন্ধ আতুরকে গৃহে আহ্বান করিয়া দান সুখ অনুভব করে। এখনও বার্ষিকের লোভে বৈষ্ণবের কীর্ত্তন এবং ঠাকুর-ঘরে পূজারীর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া অপগত ধর্ম্মময় প্রবাহের সুখস্মৃতি মনে জাগরূক হয়।

নগরজীবন বলিতে আমাদের মনে সৌধমালা-শোভিত প্রস্তরময় রাজপথে শকটের ঘর্ঘরের কথা এবং কলকারখানর উদ্গীর্ণ ধূমপটলের গগন-বিসর্পী আস্ফালনের ছায়া উদিত হয়। এখানে ব্যজনে ও যান-সঞ্চালনে বিদ্যুৎ মনুষ্যের কিঙ্করত্ব করে বলিয়া মানব ভগবানের প্রিয়তম জীবরূপে অনুমিত হয়। বর্দ্ধমান জনসংখ্যার পৌরুষ-প্রকাশে প্রকৃতি-দেবী ব্রীড়া-অবনত বালিকার মত আপন নগ্ন সুষমা প্রকাশ করিতে অবগুণ্ঠনবতী। এখানে স্বাধীন পক্ষীর গান নাই, বায়সের কিচিমিচি আছে; এখানে কৃত্তিবাসের মধুর সঙ্গীত নাই, হুজুগের ছড়া আছে; এখানে মধুরতার বিনিময়ে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য, এবং সরলতার পরিবর্ত্তে চতুরতা নিত্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে মতলব না থাকিলে প্রায় কেহই কথা কহে না।

এখানে নিজেকে কোন না কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত করিতে সকলেই ব্যতিব্যস্ত; তাই এখানে সময়ের মূল্য অত্যন্ত অধিক। কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে এখানকার লোক ক্ষণকালও বিলম্ব করে না। এই মধুকর-চক্রের মত স্থানে মধুলোভে কতলোক কতদেশ হইতে আসিয়া উহার অংশ-লাভের নিমিত্ত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত। এখানে কেহবা কেবল কায়িক পরিশ্রম করিতেছে, কেহ বা মস্তিজীবীর কর্ম্ম করিতেছে, কেহ বা দেশ দেশান্তরের উৎপন্ন বা প্রস্তুত সামগ্রী আনিয়া বিবর্দ্ধমান লোক-সংখ্যার অভাবমোচনে সামগ্রীগুলিকে অধিক মূল্যযুক্ত করিতেছে; কেহ বা উৎপন্ন সামগ্রী রূপান্তরিত করিয়া অথবা অধিককাল মজুদ রাখিয়া অধিক মূল্য লইতেছে; কেহ বা উৎপন্ন বা প্রস্তুত সামগ্রীর গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া পারিশ্রমিক পাইতেছে; আবার কেহ বা ওকালতি বা চিকিৎসা কিংবা বিদ্যাদান করিয়া তদ্বিনিময়ে অর্থ-লাভ করিতেছে, এবং যতই গুণের পর্য্যালোচনা করিতেছে ততই পণ্ডিত ও বিজ্ঞ হইয়া দেশের মধ্যে ধন্য হইতেছে। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত

বলিয়া ফেরিওয়ালা বাটীর সম্মুখে ভোজ্যপেয় সামগ্রী লইয়া উপস্থিত, এবং ফেরিওয়ালারও সময় নাই বলিয়া তাহাদের মত লোকেদের নিমিত্ত অন্য এক শ্রেণীর লোক আহারীয় প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। বড় আফিস্ হইতে গৃহস্থ বাটীতে পর্য্যন্ত সকলেই শ্রম-বিভাগে নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

নগরে শ্রীহীনের সংখ্যা অতীব অল্প; সেই জন্য বিত্তবান করদাতৃগণের ব্যয় সমবায়ে রাস্তাঘাট পরিষ্কৃত, সুদৃঢ় ও আলোকময়। সময়ের মূল্য অধিক বলিয়া সকলেই শীঘ্রগতি যানে গমনাগমন করিতেছে। অদ্ভুত কর্ম্মময় ব্যস্ততা! অদ্ভুত জড়জগতের অর্চ্চনা! অদ্ভুত ব্যয়সংযমের মধ্যে কোথাও অদ্ভুত বিলাসিতা! ব্যক্তিগত সহানুভূতি কর্ম্মগত সহানুভূতিতে পর্য্যবসিত। সঙ্কীর্ণ সামান্য রথ্যাসমূহে সহস্র সহস্র বিপরীতাভিমুখী যান-বাহনের মধ্য দিয়া পথ করিয়া পাশ দিয়া নিজেকে কেবল কর্ম্মের খাতিরে সকলে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও পরিচয় নাই। গৃহ প্রত্যাগমনের পরও পার্শ্বস্থ ব্যক্তির বিপদ বা সুখ সংবাদ লইবার কারণ উপস্থিত নাই, অবকাশও নাই।

চরিত্রের ও মনের পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে নগরবাস ও পল্লীবাস উভয়ই আবশ্যক। বৃক্ষের যেরূপ বৃদ্ধিশক্তি থাকিলেও স্থলাভাবে অথবা রৌদ্রবাতের প্রাচুর্য্যের অভাবে তাহার সম্যক পুষ্টি সাধন হয় না, সেরূপ মানবেরও ক্ষেত্রের অভাবে অনেক সময় তাহাকে চির ক্ষুদ্রভাবে থাকিতে হয়। শুধু বীজই বৃক্ষের পুষ্টির কারণ নহে। ক্ষেত্র, ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা, ক্ষেত্রের প্রাশস্ত্যও বৃক্ষের পুষ্টিকারণ প্রধানতম সহায়। মানব যেখানেই বাস করুক না কেন, বহুদিন একস্থানে থাকিলে তাহার শরীর ও মন তৎস্থানোপযোগী হয়, এবং সেই স্থানেই তাহার নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অনুমিত হইতে থাকে। নগরে শিক্ষিতের ও ধার্ম্মিকের সংখ্যা অধিক, দেখিবার শিখিবার জিনিস অনেক, পাঠাগার, শিল্পাগার, হাতে কলমে ব্যাব-

হারিক শিল্প-শিক্ষার স্থান বহুবিধ। পণ্ডিতের, বৈজ্ঞানিকের, ধার্ম্মিকের, বক্তৃতা শুনিবার অশেষ সুযোগ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম পিপাসা চরিতার্থ করিবার উপায় ও অন্তরায় সর্ব্বদাই বিদ্যমান।

যেখানে কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত, সেখানে মলিনতার ক্ষেত্রও দূর বিসর্পিত। নগরে মানব যেমন সৎকর্ম্মের লক্ষ লক্ষ উদাহরণ অবলোকন করে, তেমনি অসৎ কর্ম্মেরও কোটী কোটী দৃষ্টান্ত দেখিতে পায়। পতনের পথ যত সরল, উত্থানের পথ তত সরল নহে। নগরে বিভিন্ন পথ ও ধর্ম্মাবলম্বী, ধনী, নির্ধন, নির্ম্মল-চরিত্র নরনারী, কলুষস্বভাব যুবক যুবতী, অতি বিদ্বান্, যশস্বী সুবিনীত শ্রদ্ধাস্পদ এবং বিদ্যাহীন ঘৃণিত উদ্ধত-স্বভাব, যথেষ্ট লোক আছে। এখানে একপক্ষে যেমন স্বার্থত্যাগ, দয়াশীলতা ও মহতী সত্যনিষ্ঠার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ অপর পক্ষে কুৎসিত ও ঘৃণিত প্রবৃত্তির কালিমা মাখা-গ্লানিকর পাপের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, জালিয়াতী প্রভৃতির ত কথা নাই; অপরাপর কত শত পাপকার্য্য যে প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে?

হৃদয়িক আচার ব্যবহারে, বিনয়ে, সরলতায়, অভ্যস্ত পল্লীবাসী, নগরবাসীর কৃত্রিম সামাজিকতা ও কপট শিক্ষিত বিনয় অতি বিলম্বে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের প্রাণ মিলনের দিকে, নগরবাসীর প্রাণ ভেদের দিকে, তাহাদের হৃদয় সহানুভূতিতে আর্দ্র, ইহাদের প্রাণ স্বার্থ ও উপহাসের বিকর্ষণে শুষ্ক। নগরে সকলেই স্বাধীন। এখানে সমাজের শাসন নাই। প্রতিবাসী ও স্কুলের শিক্ষকের সহিত আলাপ না থাকায় বালক বালিকাদের স্বভাবের দোষের কথা অভিভাবকের কর্ণে বড় একটা পৌঁছায় না। পল্লীজীবনে কিন্তু এগুলি একেবারেই সম্ভবপর নহে; মাতাপিতার শাসনে প্রতিবাসীর সমক্ষে এমন কি স্বগ্রামবাসী সামান্য লোকের সমক্ষেও অসৎ কর্ম্ম করিতে বালকেরা ভীত হয়, পাছে

ইহারা অভিভাবকের নিকট গমন করিয়া সমস্ত কথা ব্যক্ত করে। এ নিমিত্ত পাঠে অবহেলা করিবার অনেক পথ নগরে সুপ্রশস্ত। ভদ্রতা, নম্রতা, অতিথেয়তা, ও অন্যান্য সুকোমল মানসিক বৃত্তি, স্বতঃই পল্লি গৃহে অঙ্কুরিত হয়। নগরে এগুলি কিন্তু পুস্তকপাঠে শিক্ষা করিতে হয়। বিলাসিতার মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া পল্লিবালকেরা বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে না পারিয়া মাতাপিতার উপর অকারণ অসন্তুষ্ট হইতে পায় না। পল্লির শিক্ষা নগরের শিক্ষা অপেক্ষা অপ্রশস্ত হইলেও মনোজ্ঞ, কারণ নগরে জ্ঞানের বিস্তারের সহিত হৃদয়ের অনুষঙ্গী কোমলবৃত্তির পূর্ণতালাভে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত ; অধিকন্তু অসন্তোষ ও দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা অনেক সময় নগরবাসী যুবককে অভিভূত করিয়া ফেলে।

দুঃখের বিষয় ঋতুবিশেষে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বশতঃ ও নগরে কর্ম্মসংস্থানের সুবিধা বিষয়ে গ্রামে আর বর্দ্ধিষ্ণু জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্য গ্রামের লোকগুলির সরলতার মধ্যে আজিকালি কিছু নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেদের সহিত সহবাসে তাহাদের অনুসন্ধিৎসা ও পাঠেচ্ছা বলবতী হয় না। ভোগবাসনা নিরুদ্ধ থাকায় ধনাগমের নবনবোন্মেষিণী বুদ্ধির বিকাশ হয় না। বিজ্ঞান ও বুদ্ধি আদৌ উন্মেষিত হয় না ; এবং প্রতিযোগীর অভাবে আকাঙ্ক্ষাও উচ্চ হইতে পায় না। এই সকল দেখিয়া "পল্লিবিলাপের" কবি লিখিয়াছেন—

"যে হয়েছে কৃতবিদ্য, (?)
লভেছে সম্পদ বল,
সেই করিয়াছে ভিটা
শ্বাপদভ্রমণস্থল !
নগরের হর্ম্ম্যবাসে
সেই সে গিয়াছে চলি,

হয়েছে পৈত্রিক বাস্তু
গৃহহীন মরুস্থলী!
রহিয়াছে শুধু মূর্খ,
দীন দরিদ্রের দল,
করে ক্ষুদ্র স্বার্থ লয়ে
নিত্য দ্বন্দ্ব কোলাহল!
সৎশিক্ষা পাবে কোথা?
ধরিবে আদর্শ কার?
কে তাদের শিখাইবে?
সত্যসাধু ব্যবহার?”

জীবনের দীর্ঘ অবকাশে বাস্তবিক আলস্যই প্রধান সহচর হয় এবং অলস ব্যক্তির মস্তিষ্ক সয়তানের লীলাভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহামতি কার্লাইল বলিয়া গিয়াছেন “Labour is life”। অলসের হৃদয়ে পাপ-বীজ একবার রোপিত হইলে, তাহার আর উৎপাটন করিবার কেহই পল্লীতে দৃষ্ট হয় না। এখানে অলসতার জন্য অধঃ হইতে অধস্তর সোপানে পতিত ব্যক্তিতেও যেন কল্মষের উগ্রতা নাই; যেহেতু পাপও যেন এখানে অলসতা প্রাপ্ত হয় এবং সে ব্যক্তি গ্রামত্যাগ না করিলেও তাহার অধঃপতন স্থগিত হইতে পারে, কিন্তু পাপবীজ সমূলে উৎপাটন করিতে অথবা চিত্তকে উন্নত মার্গে চালিত করিবার শক্তি পল্লিতে বড়ই বিরল। তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে পল্লীবাসীরা যতই দোষ করুক না কেন, তাহাদের দোষ নগরবাসীদের মত তীক্ষ্ণ ও ভয়ঙ্কর সমাজবিপ্লবকর নহে। গ্রামবাসীরা সহস্র পাপে লিপ্ত থাকিলেও তাহাদের স্বভাবজাত দেবদ্বিজে ভক্তি, সরলতা, সহৃদয়তা ও চক্ষুলজ্জা তাহাদিগকে ত্যাগ করে না। তাহাদের পাপের মধ্যেও যেন শান্তভাব পরিদৃশ্যমান। নগরে জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইলেও পাপ-প্রবৃত্তি নিরোধ

বিষয়ে চৈতন্য-সঞ্চার হইলেও মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বিকাশ পাইতে অনেক বাধা বিপত্তি। স্বাভাবিকতায় মানুষকে যত মনোজ্ঞ বোধ হয়, কৃত্রিমতায় যেন মানবিকতা ততই ম্লান হইয়া পড়ে।

অতএব মনুষ্যত্বলাভে নগরজীবন ও পল্লীজীবন পরস্পর পরস্পরের অঙ্গপুষ্টি করে। কেবল সহরে বাস করিলেই জীবনের সমস্ত শিক্ষালাভ করা হয় না, এবং কেবল গ্রামে বাস করিলে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া যায় না। মুড়ি খাইয়া সামান্য উপানহে সন্তুষ্ট গ্রাম্য বালক কলিকাতার মত মহানগরীতে আসিয়া ক্রমে ক্রমে বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত হইতে ইচ্ছা করে। ক্রমে তাহার আহার, বেশভূষা, সমস্তই গ্রামবাসীর অননুমোদিত হয়। সে ব্যক্তি হৃদয়-কপাট খুলিয়া আর হৃদয়বান্ গ্রামবাসীর সহিত কথা কহিতে সমর্থ হয় না। তাহার সঙ্কুচিত ভাব, তাহার কৃত্রিম সামাজিকতা তাহাকে আর অভিন্ন পল্লীবাসী বলিয়া উহাদের দলভুক্ত হইতে দেয় না। তাহার পূর্ব্বেকার নিরুদ্ধ বিলাস-বাসনা, তাহার হৃদয়িকতা, ভক্তি, বিনয় ও অকৃত্রিম সামাজিকতা যদি অপ্রতিহতভাবে নগরে প্রবিষ্ট হইয়া অপরকে প্রবুদ্ধ করিত, তাহা হইলে নগরবাসের দোষ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকিত। সে ব্যক্তি নাগরিক হইয়া যদি পল্লীর গঠনযোগ্য সরলচরিত্র অধিবাসীদিগের বিদ্যা ও জ্ঞান-নেত্র অর্দ্ধ উন্মীলিতও করিতে পারে, তাহা হইলে পল্লীবাসীও নানাগুণে অলঙ্কৃত হইতে পারে। ফলতঃ পল্লীর গুণ যদি নগরবাসী অনুকরণ করিতে পারে এবং নগরবাসীর গুণ ও কর্ম্মসামর্থ্য যদি পল্লীতে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে অনুষ্ঠানের আধিক্যে সমগ্রদেশের অবস্থান্তর হইতে পারে। দরিদ্র কৃষক, পণ্যজীবী, গৃহস্থ, বর্দ্ধিষ্ণু, জ্ঞানী ও পণ্ডিতে, কি নগর, কি পল্লী, উভয়ই শোভা পাইতে থাকে। এদিকে একতা ও সহানুভূতির জাজ্জ্বল্যমান ছবি সমগ্র বঙ্গদেশের গৃহ মাত্রেই পরিদৃষ্ট হইবে এবং বঙ্গবাসী মাত্রই দেশকালপাত্রানুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত

হইয়া ধনাগমের পন্থা আবিষ্কৃত করিয়া অতৃপ্তির আর্ত্তনাদ ভুলিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতির সংখ্যা-হ্রাস এবং তাহার নিরাকরণের উপায়।

বঙ্গদেশে যে হিন্দুজাতির সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে, কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে অথবা কোন মহকুমায় থাকিয়া আমরা বড় একটা তাহা বুঝিতে পারি না। পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলে কিন্তু ঘোর সন্দেহের আবির্ভাব হয়। যেখানে পূর্ব্বে গোয়ালা-পাড়ায়, তাঁতি-পাড়ায়, কুমার-পাড়ায়, নিকিরী-পাড়ায় শ্রেণীবদ্ধ বাসগৃহ বিরাজ করিত, সেখানে খান কত জীর্ণ কুটীর, অথবা সাবেক ভিটা, কিম্বা একটা বেলগাছ কি চাঁপা-ফুলের গাছ বা সিউলিফুলের গাছ দেখিয়া মনে হয় যে এগুলি যে, জনহীন ভিটার পরিচয় দিতেছে সে ভিটার অধিকারীরা কোথায় গেল? ধনী ও বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থদের বাটী সহজে ধূলিসাৎ হইবার নহে, সেই জন্য সে গুলির ভগ্নাবশেষ এখনও কত অতীতের কথা স্মৃতিপথে আনিয়া দিতেছে। কত ঢালতলোয়ারধারী নিধিরাম সর্দ্দার, ভজহরি সর্দ্দার, তাহাদের দ্বারে ছিল—কত বঙ্গীয় দাস দাসী—কত রায়ত জন ও প্রজা—কত পূজারী ব্রাহ্মণ—কত দূর কুটুম্ব ও কুটুম্বিনী—কত গাভী, গোশালা ও রাখাল—কত চাল কাঁড়িবার ও ডাল ভাঙ্গিবার গ্রাম সম্পর্কের স্ত্রীলোক যাহারা এ সব গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল?

অনেকে বিদেশে চাকরী বা ব্যবসায় করিতে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা ভদ্রলোক না ছোটলোক? ভদ্রলোক ছোটলোককে লইয়া যান নাই এবং ছোটলোকও ভদ্রলোকের ভরসায় বিদেশযাত্রী হয় নাই। অতএব একের বিহনে অপরের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা

দেখিবার ও জানিবার বিষয়। আমার দেশের ভদ্রলোক চিরকালই কায়িক পরিশ্রমে কাতর। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার শ্রামিকের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছে। তিনি যে বঙ্গের এক পল্লী ত্যাগ করিয়া অন্য পল্লীতে না গিয়া বঙ্গদেশের কোন নগরে অথবা কোন বড় ব্যবসার স্থানে গিয়াছেন, তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। এবং এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তথাকার শ্রামিকেরা নবাগত ব্যক্তির আগমনে সংখ্যায় বর্দ্ধিত না হইলেও যেরূপ বেতন বর্দ্ধিত করিয়া লইল, তাঁহা দ্বারা পরিত্যক্ত পল্লীর শ্রামিক সেই পরিমাণে কর্ম্ম সংস্থান হইতে বঞ্চিত হইল। কেবল যে কিছুকালের জন্য তথাকার শ্রামিক বঞ্চিত হইল, এরূপ নহে, অনেকস্থলে তাহার সেই ক্ষতি চিরস্থায়ী হইল, কারণ তাহার পল্লীতে নূতন লোক-সমাগমের কোন সম্ভাবনাই হইল না; অধিকন্তু যিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরিবারের অনুপযুক্ত ব্যক্তি অথবা বিধবা ব্যতীত প্রায় সকলেই তাঁহার পথানুবর্ত্তী হইল। এইরূপে পল্লীত্যাগ প্রায় তিন চারি পুরুষ হইতে চলিয়া আসিতেছে। যখন প্রথম এই অনর্থের আরম্ভ হয়, তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের পথ অপরে অনুসরণ করিলে অচিরে দেশের তরি-তরকারীর মূল্য দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইবে; তখন তাঁহারা মনে করেন নাই যে, তাঁহাদের মত বেতন পাইয়া তাঁহাদের বংশধরেরা আর সে অর্থে সে পরিমাণ সামগ্রী ভোগ করিতে পাইবে না; তখন তাঁহারা ভাবেন নাই যে, যাঁহাদের লইয়া তাঁহাদের এই পল্লী গঠিত হইয়াছে, যাঁহাদের মুখপানে চাহিয়া শত শত শ্রমজীবী জীবন-সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, যাঁহাদের ন্যায়-পরতায় ও ধর্ম্মপ্রাণতায় নির্ভর ও বিশ্বাস করিয়া সরল কৃষক হইতে শিল্পী ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বিবাদের সূত্রপাতেই তাহা আপোষে মিট নাট করিয়াছে এবং নিজ-গৃহ-উচ্ছেদকারী মামলায় লিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বিরত

হইয়াছে—আজি তাঁহাদের অভাবে কুলালচক্র অচল, গাভী প্রতিপালন অসম্ভব, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা সুমলপঙ্কিল, রথ্যাদি গুল্মলতাদিতে সমাচ্ছন্ন, প্রজা দুর্ব্বল ও হতাশ হইয়া ধর্ম্মাধিকরণে ব্যয় করিয়া বিচারপ্রার্থী; তাঁহাদের অভাবে আজি সর্ব্বত্রই নৈরাশ্য ও স্তিমিতভাব পরিদৃশ্যমান,—সুখশান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধাস্বাদ বহু অতীতের কথা। তাঁহারা ভাবেন নাই যে, ছিদ্র পাইয়া ম্যালেরিয়া ও জরা আসিয়া নিজ সংহারপক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক দীঘির কাল জলে বসিবে,—তাঁহারা ভাবেন নাই যে, তাঁহাদের ভগ্নচূড়-গৃহে আর দুর্নীতির শাসন হইবে না।

দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও প্রস্তুত করিয়া তদ্বিনিময়ে অন্য সামগ্রী পাইবার আকাঙ্ক্ষা এইরূপে নিষ্ফল ও প্রতিহত হওয়ায় অনায়াসে অপরের পরিশ্রমলব্ধ-ধনসামগ্রী-লাভের বাসনা অনেকেরই চিত্ত আকৃষ্ট করিল। স্বর্ণকারের কর্ম্মশালা দিবসে রুদ্ধদ্বার হইয়াও দস্যুতস্করের সুবিধার নিমিত্ত রাত্রে কর্ম্মময় হইয়া উঠিল। নিজ বাস্তু-ভিটা পরিত্যাগ করা উচিত কিনা এই চিন্তার আন্দোলনে দুই তিন পুরুষ কাটিয়া গেল। এ দিকে পূর্ব্বকার ম্লেচ্ছ রাজার পরিবর্ত্তে অন্য রাজার রাজত্ব সম্পূর্ণ বিস্তৃত হইয়া উঠিল। এই রাজার জাতি যে কেবল মুসলমানদের মত বল-বীর্য্যবান, এরূপ নহে, ইহারা জগৎপ্রসিদ্ধ শিল্পী ও সর্ব্ববিদিত ব্যবসায়ী। যেখানে যেসামগ্রীর অভাব, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আমদানী করিয়া তাহা মোচন করিলেন; কিন্তু যে সামগ্রীগুলি আনিলেন, সেগুলি যে কেবল প্রয়োজনীয় ও দৃশ্যমনোহর এরূপ নহে, সেগুলি ধনবিজ্ঞান-সম্মত আপেক্ষিক ব্যয়ের (Comparative cost of production) তারতম্যানুসারে শ্রমবিভাগে উৎপন্ন ও প্রস্তুত বলিয়া অপেক্ষাকৃত সুলভ। ইংরাজগণের আবির্ভাবে মুসলমান অরাজকতা হইতে শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া দেশীয় বণিকগণের ধন সামগ্রী অধিক পরিমাণে রক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল এবং এদেশ হইতে কাঁচা মালগুলি বিদেশে

রপ্তানী হইয়া তথাকার কল কারখানা সাহায্যে পাকা মালে পরিণত হইতে লাগিল। কলকারখানার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সহিত কাঁচা মালের যথানিয়ম যোগান অপেক্ষা টান অধিক হইল; তন্নিমিত্ত কাঁচা মালের দরও চড়িয়া গেল এবং টাকার টান অনুভূত হওয়ায় সুদের হারও বর্দ্ধিত হইল। এ জন্য পূর্ব্বেকার বণিকেরা বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া মহাজনের কার্য্য করিতে লাগিল। নিরুদ্ধ বিলাসভোগবাসনা, ভোগ সামগ্রীর বৈচিত্র্যে ও সুলভতায় উচ্ছৃঙ্খল হইল। বিলাসীর সহবাসে অনুৎপাদনকারীর বিলাস বাড়িল। নিত্য নব অভাব মোচনে নবনবোন্মেষিণী বুদ্ধি জাগ্রত হইল না। স্থিরনিশ্চিত-পরিবর্ত্তিত অবস্থার অনুরূপ আবশ্যক উপযোগিতার অভাব পরিদৃশ্যমান হইল। হিন্দু শিল্পী সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল। শিক্ষা দীক্ষার কোন বন্দোবস্ত হইল না। শ্রামিকের কর্ম্মসামর্থ্য ব্যর্থ হইল। কর্ম্মকর্ত্তারও (Entrepreneur) অভ্যুদয় হইল না।

এ দিকে পল্লীতে হাঁড়ি কলসী কিনিবার লোক নাই। পূর্ব্বে কুমারদের এমনি একতা ছিল, যে জমীদার জমী লইয়া গোলযোগ করিলেই ইহারা "হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিত।" এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলেই হাটে আর হাঁড়ি আমদানি হইত না; দেশের লোক মিলিয়া তাহাদের আবেদনে কর্ণপাত করিতেন। আজকাল কয়লার জ্বালে সকল হাঁড়ি টিকে না। পরন্তু সহরে অনিবার অসুবিধা ও খরচ। এই জন্য অনেক স্থলে কুমারের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘাটালের মত কয়েকটী মাত্র স্থানের কুমারেরা সম্পূর্ণ শ্রমসামর্থ্য দেখাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হইলেও সমগ্র বাঙ্গলার কুম্ভকারদের কর্ম্ম-সংস্থান হইতেছে না।

তাঁতির অবস্থা জোলার অপেক্ষাও মন্দ। জোলারা কর্ম্মের অভাবে জমী কর্ষণ করিতেছে। কিন্তু তাঁতিরা তাহা এখনও করিতে পারে নাই। কেবল ধনী লোকেরই তাঁতের কাপড় খরিদ করা সম্ভব এবং বঙ্গদেশে ধনীর সংখ্যা ক্রমিকই হ্রাস পাইতেছে; অধিকন্তু রাজসরকারে

বা সভাসমিতিতে দুই তিন পুরুষ হইতে কাটা কাপড়ের প্রচলন বদ্ধমূল হইয়াছে।

কাঁসা পিতলের বাসনের প্রচলন এখনও আছে, তথাপি এনামেলের বাসন প্রায় অর্দ্ধেক স্থল অধিকার করিয়া লইয়াছে। একটী পিতলের গেলাস যত দিন চলে, চারিটী এনামেলের গ্ল্যাস সে সময়ে ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু পিতলের গ্ল্যাস ভাঙ্গিলেও উহা পিতলের দরে বিক্রীত হয়। অথচ এনামেলের গ্ল্যাস অব্যবহার্য্য হইলে তদ্বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যায় না। এই প্রকারে যে কেবল কাঁসারীর আয় কমিতেছে এরূপ নহে, যে সকল দরিদ্র শ্রমজীবী এনামেলের গেলাস ক্রয় করিতেছে, তাহাদের ও মোটের উপর ধননাশ হইতেছে।

বাঙ্গালী কামার আজ কাল আর সকল পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে বঙ্গের প্রায় অনেক স্থান, খাঁগড়া, ক্যান্তে দা, কুড়াল প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখন বাঙ্গালার বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে নূতন দা অথবা বঁটী আমদানি হয়। দুর্গাপূজার সময় বলী দিতে কামার আবশ্যক হয়, কিন্তু দুর্গাপূজার ব্যয় প্রায় সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ভাল ছুরি কাঁচি ও ঢালাই কড়া ভারতের বাহির হইতে আসে এবং পেটা কড়া বেহার অঞ্চলে অল্প মজুরিতে প্রস্তুত হয়।

পল্লীগ্রামেও স্বর্ণকারের আবশ্যকতা এখনও অনুভূত হয়; হিন্দু গৃহে কন্যার জন্ম হইলেই স্বর্ণকার আবশ্যক। সহরে উহাদের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইলেও উহাদের সংখ্যা মোটের উপরে হ্রাস পাইতেছে। কারণ যাহারা অতিশয় দক্ষ ও কৃতকর্ম্মা তাহারাই সহরে আসিয়া অধিক নৈপুণ্য ও শ্রমসামর্থ্য দেখাইতে পাইতেছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপার্জ্জন করিতেছে; কিন্তু পূর্ব্বে পল্লীতে যে কয়ঘর স্বর্ণকার ছিল, এখন তাহার তুলনায় কিছুই নাই বলিলেই হয়।

কাঠের সিন্ধুকের পরিবর্ত্তে এখন লোহার ট্রাঙ্কের ব্যবহার প্রচলিত

হইয়াছে ; তবে পক্ষান্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী চেয়ার টেবিল প্রস্তুত হইতেছে। সেগুলি প্রায় কর্ম্মকর্ত্তার শ্রমবিভাগ-বুদ্ধিতে প্রস্তুত হয় বলিয়া কেবল উপযুক্ত ব্যক্তিরাই সম্পূর্ণ শ্রমসামর্থ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতেছে। কিন্তু পল্লীর সূত্রধরেরা গোশকটের চক্র অথবা লাঙল নির্ম্মাণ ভিন্ন অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পাইতেছে না।

এক্ষণে প্রস্তুতিকারদের ত্যাগ করিয়া একবার উৎপাদকদের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। বিবাদ বিসম্বাদ আসিয়া শ্রম-বিভাগ-বিধিতে কর্ম্মসাধনে বাধা দিতেছে। কেবল নিড়ানে পটু বৃদ্ধ কৃষক গভীর করিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে পারিতেছে না এবং কেবল গভীর কর্ষণে পটু যুবা কৃষক ভাল করিয়া জমী নিড়াইতে পারিতেছে না। উভয়ের সমবেত শ্রমসামর্থ্য কোন ভূমিই লাভ করিতেছে না। এ দিকে জমীদার মহাশয় রাজধানীতে থাকেন বলিয়া ভাগাড়গুলি অস্থিকঙ্কাল শূন্য। এইরূপে ক্ষেত্র সমুদায় সারবর্জ্জিত হইতেছে। তাহার উপর কৃষক শ্রমবিভাগ প্রথায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; সুতরাং জমীতে আর অধিক ফসল জন্মে না ; যাহা কিছু জন্মে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণে সে তাহা নিজে কাটিতে পায় না ; সেই জন্য অধিক মজুরী দিয়া তাহাকে কৃষাণ নিযুক্ত করিতে হয়। অপরকে অধিক মজুরী দিয়া কর্ত্তিত ধান্যে মহাজনের ঋণের সুদ বণ্টিত করায় উৎপাদন-ব্যয় (Cost-of production) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং অধিক সুদে নিয়োজিত মূলধন হইতে লাভের হার ক্রমিক হ্রাস (Law of diminishing returns) পাইতে থাকে।

উৎপাদকের মধ্যে দেখা গেল তাহাদের লাভ এখন ক্রমিকই হ্রাস পাইতেছে, এবং প্রস্তুতিকারদের অনেকেরই অবস্থা শোচনীয় ; কারণ যাহারা সহরে আসিয়া আধুনিক উন্নত উপায়ে সামগ্রী প্রস্তুত করিতে সক্ষম, এরূপ নিতান্ত উপযুক্ত কয়েক ব্যক্তি ব্যতীত অনেকেই

কর্ম্মসংস্থান-হীন।' হিন্দু ও মুসলমান জাতির অভাবমত সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া যাহারা জীবন-সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, আজ তাহারা উহাদেরই আধুনিক ভিন্ন জাতীয় অভাব মোচন করিতে অক্ষম। আজ কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ইউরোপীয়দের অনুকরণে আপনাদের বাসনাপ্রীতিকর সামগ্রীতে মুগ্ধ। অতএব দেশের খরিদ দারগুলির ক্রয়সামর্থ্যও প্রাচীন শিল্পীর সাহায্যে আসিতেছে না। সচরাচর দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে লাভহ্রাস হইতেছে দেখিয়া অনেকে পাটের চাষ করিতেছে বটে, তথাপি উন্নত কৃষি-পদ্ধতি আজিও প্রবর্ত্তিত হইল না; অধিকন্তু সস্তায় মূলধন-প্রাপ্তির কোন বিধিতেই দেশের ভদ্রলোকের আন্তরিকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে পল্লী-ত্যাগী স্বদেশী হইতে লাঞ্ছিত হইয়া হিন্দু উৎপাদক ও নির্ম্মাতা যে নূতন রাজা ও ইউরোপীয়গণের অনুষ্ঠিত নানাবিধ কার্য্যে নিজেদের সামর্থ্য দেখাইবে, তাহারই বা উপায় কৈ?

হিন্দু চিরন্তন সংস্কারের অধীন। ধর্ম্ম তাহার কর্ম্মে বাধা দিতেছে। মুসলমানের এক মনিব ছিল, এখন দুই মনিব হইয়াছে; তন্মধ্যে একের ব্যয়-সামর্থ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রত্যেক ইয়োরোপীয়ের অন্ততঃ দুইটী মুসলমান চাকর দরকার। আদালতের দপ্তুরি, পেয়াদা, ঘোড়ার গাড়ীর সহিস কোচুয়ান, রেল জাহাজের খালাসী প্রায় সকলেই মুসলমান। অল্প বেতনে হিন্দু তাহার ধর্ম্মপত্নী ও পুত্রকে প্রতিপালন করিতে পারে না, তাই রামা শ্যামা আমাদের বাড়ীতে স্থান পায় না। নিকাতে ও এক-পয়সার ছাতুতে সন্তুষ্ট কাহার কুর্ম্মী তাহার স্থান লইয়াছে। রাজ-ধানীতে আসিবার সময় আমরা ভজহরি সর্দ্দারকে আনি নাই, তাই সে দস্যুদলে আশ্রয় লইয়াছে। কৈ ছোটলোক হিন্দুকে ত বাড়ীতে দেখিলাম না, আদালতে দেখিলাম না, রেলে জাহাজে দেখিলাম না— আমরা এখন কাপুড়ে বাবু হইয়াছি, তবু তাহাকে কাটা পোষাকের

দোকানে দেখিলাম না—তবে সে গেল কোথা ? আজ দুই তিন পুরুষ হইতে তাহার রোজগারের পথ একেবারে বন্ধ। বাবুরা পল্লীত্যাগ করায় ম্যালেরিয়া তাহার প্রভু; জমীদার তাহার কাতর মর্ম্মবেদনায় কঠোর হাস্য উপহার দিতেছে;—তাহার বিপদে আর ভিক্ষার হাট* বসে না;—হিন্দু সংস্কার তাহাকে বাটী হইতে বাহিরে ম্লেচ্ছের কর্ম্ম করিতে দেয় নাই—তাহার ধনভাণ্ডার বহুদিন হইতে শূন্য। চতুর্দ্দিক হইতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াও পিণ্ডের ব্যবস্থায় হালের গরু ও যোথ জমা বাঁধা দিয়া সে তিনকুড়ি বয়সে দার পরিগ্রহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পত্নীর যৌবন-উদ্ভেদের পূর্ব্বে তাহার ইহলীলা সংবরণ হইয়াছে। তাই আজ ঘোষের পো—তেলির পোর পরিবর্ত্তে গয়লাবৌ তেলিবৌ আসিয়া আবেদন অভিযোগ করিতেছে, বহুপুরাতন মনিবের বংশধরের নিকট পূর্ব্বপুরুষের কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছে। পল্লীর শ্মশান এখনও তাহাদের কাতরধ্বনিতে বাবুদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভিক্ষা করিতেছে। সমগ্র হিন্দু পরিবার নূতন রাজার আবির্ভাবে পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী হইবার নিমিত্ত যে ভ্রান্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হইতেছিল, তাহার বশে আজ দরিদ্র হিন্দু পিতৃহীন, অসহায়, সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং ভদ্র হিন্দু নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া, এবং নিজেও অনুতপ্ত না হইয়া আজ লাট সভায় রাজার সহানুভূতি-প্রার্থী। তাই কবির কথায় বলিতেছি ;

"কিন্তু হায় ! পল্লীগুলি—
সারা ভারতের প্রাণ—
হলে ধ্বংস, হবে ধ্রুব—
দেশলক্ষ্মী অন্তর্ধান !"

পল্লীবিলাপ।

---

* পূর্ব্বে উৎপাদনকারী দরিদ্র হিন্দুর পিতৃশ্রাদ্ধাদির সময় ভিক্ষার হাট বসিত

"শ্রামিককে দেয় মূলধনের অনুপাতে শ্রামিকের সংখ্যা হ্রাস করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ অনেক নিয়ম প্রচলিত আছে; যথা—নির্দ্দিষ্ট বয়সে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধনসম্পত্তির অধিকারী না হইলে সংসার-প্রতিপালনে অক্ষম বলিয়া বিবাহ করিতে পারিবে না।

বঙ্গদেশের ধনবিজ্ঞানবিদেরা বিধান করিয়া গিয়াছেন যে, শ্রামিক-জাতি অর্থ দিয়া স্ত্রী সংগ্রহ করিবে। কর্ম্মকার, সূত্রধার, তন্তুবায়, কুম্ভ-কার, গোপ প্রভৃতি অনেক জাতির মধ্যে সেই নিয়ম আজিও প্রচলিত দেখা যায়। টাকার জোগাড় করিতে না পারাতে অনেকের ভাগ্যে বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। অনেকে আবার বিবিধ চেষ্টার পর পরিণত বয়সে অর্থসংগ্রহ করিয়া বালিকাপত্নী লাভ করিয়া থাকে। সেই বালিকার যৌবনোদ্ভেদ হইবার পূর্ব্বেই অনেক স্থলেই তাহার বৃদ্ধ স্বামীর লোকান্তর ঘটিয়া থাকে। এইরূপ নানা কারণে ঐ সকল জাতির বংশবৃদ্ধি এক প্রকার রহিত হইয়া গিয়াছে। আজি কালি অনেক গ্রামে একটীও কুম্ভকার বা কর্ম্মকার পাওয়া যায় না। শাস্ত্রকারগণের কঠোর নিয়মই যে, এই সকল শ্রামিক সম্প্রদায়ের বংশলোপের অন্য একটী কারণ, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এইরূপ নিয়ম-প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য কি?—দেশে যাহাতে শ্রামিকের সংখ্যা এবং তজ্জন্য জীবন-সংগ্রাম বৃদ্ধি না পায়। বিবেচনা কর, দেশে ভূমির পরিমাণ-বৃদ্ধি হই-তেছে না; কিন্তু লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। যদি বঙ্গ-দেশের শ্রামিকদের বংশবৃদ্ধি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে নিরুদ্ধ করা না হইত, তাহা হইলে মজুরী হ্রাস পাইত এবং বর্দ্ধমান জনসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভূমিসম্পত্তি লইয়া ভীষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের

অর্থাৎ পটোল ওয়ালার বিপদুদ্ধারের জন্য সে দিন হটে আর অন্য পটোল-ওয়ালা আসিত না এবং পূর্ব্বোক্ত পটোল ওয়ালার পটোল অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত।

বিষয় এই যে, শ্রামিকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইলেও নানা কারণে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না অথচ অন্য দেশে শ্রামিকদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলেও তাহাদের অনেকের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গদেশ ব্যবহারিক শিল্পবিদ্যায় পশ্চাৎপদ এবং একপ্রকার স্থিতিশীল। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে উপায়ে এ দেশে শিল্পজাত বা কৃষিজাত দ্রব্যসমূহ উৎপাদিত হইত, আজি বিজ্ঞানের দীপ্ত আলোকে নানাবিধ কলকারখানা ও শ্রমসংক্ষেপের যন্ত্রসৃষ্টি হইলেও বঙ্গদেশীয় স্থিতিশীল শিল্পী তৎসমুদায়ের সাহায্য লইতে অগ্রসর হইতেছে না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জাতিনিবহ উন্নত বিজ্ঞান-বলে কলকারখানার সাহায্যে অসংখ্য নিত্য ব্যবহার্য্য ও বিলাস দ্রব্য সস্তায় প্রস্তুত করাতে আমরা স্বদেশের অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ শিল্পজাত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই সমস্ত বৈদেশিক দ্রব্য ক্রয় করিতেছি, তাহাতে এদেশীয় শ্রামিকদিগের বেতন-সংস্থান কমিয়া যাইতেছে। এইরূপে নিজকর্ম্মদোষে ও আমাদিগের নিজের বহুদর্শিতার অভাবে আমরা অস্মদ্দেশীয় হতভাগ্য শ্রামিকদিগের দুর্ভাগ্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতেছি। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ যে ভূয়োদর্শন-বলে শ্রামিকদিগের বেতনসংস্থান বর্দ্ধিত করিবার সদুপায় বিধান করিয়াছিলেন, অকর্ম্মণ্য আমরা বিজ্ঞানবলের সাহায্যে প্রয়োজনীয় কলকারখানা এবং শ্রমসংক্ষেপের যন্ত্রাদি সৃষ্টি না করিয়া বৈদেশিক সুলভ দ্রব্যসামগ্রী-লাভেই কৃতার্থম্মণ্য হইতেছি, তথাপি সুলভে বহুল পরিমাণে দেশীয় দ্রব্যসামগ্রী নবোদ্ভাবিত উপায়ে কলকারখানা-সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া দেশের মূলধন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছি না এবং মূলধন না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠানের অভাবে শ্রামিকদের বেতন প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয় না।

পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয় বলিয়া পূর্ব্বেকার শ্রামিক জাতির যেমন বংশ বৃদ্ধি হইতেছে না, শ্রামিকদিগের বেতন-সংস্থান স্বরূপ মূলধনও

পশ্চাৎপদ বঙ্গদেশে বৃদ্ধি পাইতেছে না। বঙ্গদেশে ব্যবহারিক শিল্প-বিস্তার অভ্যুদয়ে যদি উন্নত উপায়ে কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, অথবা কাঁচা মালগুলি সুলভে পাকা মালে রূপান্তরিত করিবার নব নব উপায় উদ্ভাবিত হয়, তাহা হইলেই বর্দ্ধমান মূলধনের অনুপাতে বঙ্গদেশ-বাসী শ্রামিকের বেতন বৃদ্ধি হইবে, নচেৎ এতদ্দেশবাসী শ্রামিকের প্রাপ্য বেতন অন্যদেশবাসী শ্রামিক লইয়া যাইবে।

বঙ্গদেশের ধনবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন; আধুনিক বঙ্গদেশবাসী তাহাদের বেতনবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন না করিলে তাহারা ক্রমে অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িবে। এক পাটের চাষের অনুষ্ঠানে পূর্ব্ববঙ্গদেশবাসী শ্রমজীবীর * বেতন অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী খরিদ করিয়াও কেহ কেহ সঞ্চয় করিতে পারিতেছে, বা বিলাসসামগ্রী উপভোগ করিতেছে। এইরূপ নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান আরব্ধ না হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং লোকসংখ্যার অনুপাতে দেশের মূলধন বৃদ্ধি না হইলে শ্রামিকদের বেতন বৃদ্ধি হইবে না।

(১) সস্তায় ও সুগমে মালের গতিবিধি,

(২) সহজে সুবিধাজনক হারে মূলধন-প্রাপ্তি,

(৩) কাঁচা মালপ্রস্তুতির নিমিত্ত বিস্তৃত জমির ব্যবহার,

(৪) এবং ব্যবহারিক শিল্পশিক্ষার বিস্তার আরম্ভ, †

হইলে দ্রব্যসামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপন্ন ও প্রস্তুত হয়।

(১) এক রেল-বিস্তারে আজ পর্য্যন্ত ২৪০০ শত লক্ষ মুদ্রা ভারতবর্ষে ব্যয়িত হইয়াছে; কত শত লক্ষ মুদ্রা খাল-খননে ও রথ্যা-নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এখন খালে পর্য্যন্ত

* ইহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অধিক।

† ("Commerce of nation" by C. F. Bastable).

ষ্টীমার নৌকা এত অধিক যাতয়াত করে, পাকা রাস্তায় এত অধিক গরুর গাড়ী চলিতেছে এবং বহু বিস্তৃত রেলপথে মাল গাড়ীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে ও হইতেছে, যে মালের গমনাগমন বিষয়ে ভারত-বাসীকে আর অধিক চিন্তা করিতে হইবে না।

(২) মূলধন আমাদের দেশে সহজে অল্প সুদে পাওয়া যায় না। ইহার একমাত্র কারণ আমাদের দেশীয় মূলধন অল্প ও দেশীয় ব্যাঙ্ক নাই এবং বিজাতীয় যে সকল ব্যাঙ্কে আমাদের ধনীদের অর্থ প্রেরিত হয়, উহা ধনীদের হিসাবে জমা ও ব্যাঙ্কের হিসাবে ধার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপে বহু অর্থ বিজাতীয় ব্যাঙ্কারগণ অল্প সুদে ধার করিয়া, তাহারা যাহাদের বিশ্বাস করে, তাহাদের আবার ধার দেয়। আজ পর্য্যন্ত আমরা বিশিষ্টরূপে কোন ব্যবসায় চালাইতে পারি নাই। আমাদের বাজারসন্ত্রম অত্যন্ত অল্প বলিয়া আমরা সহজে ধার পাই না। ব্যয় সংযম করিয়া লোকে যে মূলধনের সৃষ্টি করে, উহা নিজে ব্যবহার করিতে না পারিলে ব্যাঙ্কে জমা দিয়া থাকে। এইরূপে দেশের অব্যবহৃত মূলধন ব্যাঙ্কের সাহায্যে কৃতকর্ম্মা লোক ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় লোকের এত অধিক অর্থ ব্যাঙ্কে জমা আছে যে, তদ্দ্বারা বহুবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে। কিন্তু বিদেশীয় বণিকগণই এই অর্থের ব্যবহার করিতেছে। আমাদের দেশের অব্যবহৃত মূলধন লইয়া বিদেশীয় বণিকগণ ব্যবসায় কার্য্য সুরু করিয়া লইতেছে। ফল কথা আমাদের ব্যাঙ্কও নাই, বাজার-সন্ত্রমও নাই, সুতরাং আমাদের দেশের অর্থ আমরা ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। ধনীদের ধনভাণ্ডারের কিঞ্চিৎ অংশ মূলধন করিয়া যদি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে দস্তুরমত ঐ অর্থের বিশ গুণ অর্থ ব্যবহার করিতে পারা যায়। নির্ম্মাতারা তাহাদের মাল দেখাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে "ক্যাশ ক্রেডিট" পাইতে পারেন। বিশিষ্ট লোকের মাতব্বরিতে উহাদের পরিচিত ব্যবসায়িগণ

ধার করিতে সক্ষম হইবে। প্রকৃত পক্ষে যে সকল ধনী একেবারে চাঁদা হিসাবে দান করিতে অনিচ্ছুক, এবং যে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ দান করিতে অপারক, তাঁহারা ব্যাঙ্ককে মধ্যস্থ করিয়া সুদের লোভে কৃতকর্ম্মা লোকদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

"But ever let us beware of paternalism. Not charity but co-operation is the crying need of the hour." (H. H. The Gaikwar I. I. Conference.)

থিয়রি অফ্ ব্যাঙ্কিং (Theory of Banking) গ্রন্থ-প্রণেতা স্বনাম ধন্য ম্যাক্‌লাউড (Macleod)সাহেব বলিয়াছেন "Several professions require a certain amount of ready capital to start with. In England those who enter such professions must have the actual capital ; in Scotland it is done by means of a credit guaranteed by their friends."

"These credits are granted to all classes of society to the poor as freely as to the rich. Everything depends upon character. Multitudes of men who have raised themselves from the humblest positions in life to enormous wealth began with nothing but a cash credit."

(৩) যথেষ্ট পরিমাণে জমী প্রস্তুত অথবা কাঁচা মাল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিস্তৃত জমির ব্যবহার এখনও আমাদের দেশে হইতেছে না। যে বাঙ্গালায় দেশীয় বাণিজ্যরক্ষার নিমিত্ত এত আন্দোলন, সুখের বিষয় সেই বাঙ্গালার জমীর কর্ত্তা জমীদার। জমীদার মহাশয়গণ যদি অকর্ষিত ভূমিগুলি সস্তায় বিলি করিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে জমীর উৎকর্ষ বাড়িতে আরম্ভ হইবে। কাঁচা মাল বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইবে। যদি প্রজাগণ অর্থাভাবে অসমর্থ হয়, দুই তিন জন জমীদার মিলিয়া কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন। প্রজাগণ স্ব স্ব মূলধন সমস্ত ব্যয় করিয়াও যাহাতে প্রয়োজন মত আরও

মূলধন অল্প সুদে পাইয়া খাটাইতে পারে, জমীদার নিজে তাহাদের জামিন হইলে বা প্রজার বন্ধুদের মাতব্বরিতে ধার দিতে অনুমতি দিলে, ব্যাঙ্ক যাহাতে তাহাদিগকে ধার দেয়, তাহার বিধান নিতান্ত আবশ্যক। পুষা কলেজে শিক্ষিত হইয়া কৃষিকার্য্যে নিপুণ জমীদার দিগের আত্মীয়গণ যদি নিজ নিজ জমীদারিতে চাষের উন্নতি সাধন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে কাঁচা মালে দেশ ভরিয়া যাইবে।

"Motherland is the source of all wealth, manufacturing as well as agricultural, and manufacturing industries rise and fall with the produce of the land, and therefore the man who holds the the land of Bengal holds the key to his country's wealth."

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির হ্যামিল্টন সাহেবের এই কথার আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

আমেরিকার ওয়াকার সাহেব বলেন, আমেরিকার প্রজা ও জমিদার নিজ নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। জমিদার খাজনা চাহিলে প্রজা তাহার জমি ছাড়িয়া দিয়া দূরদেশে চলিয়া যায় এবং তথায় অল্প খাজনায় ও অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে শস্য উৎপাদন করিয়া লাভবান হইয়া থাকে। এদিকে জমিদারও যদি জানিতে পারেন যে, তাঁহার জমির কোন বিশেষ গুণ আছে এবং তজ্জন্য অন্য প্রজা অধিক খাজনা দিতে সম্মত হইবে, তাহা হইলে তিনি খাজনা বৃদ্ধি করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না।

ভারতবর্ষে অজ্ঞ জমিদার ও প্রজার সংখ্যাই অধিক। জমির খাজনা কি উপায়ে বাড়িতে পারে, অনেক জমিদার সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করেন না। চাষীকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কৃষিপদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়া, কিম্বা তাহার জমিতে তূলা, রিয়া প্রভৃতির চাষে উৎসাহ প্রদান করিয়া তাহাদের বিঘাপ্রতি বর্দ্ধমান ফসলের সেই বর্দ্ধিত ধনাগমের

অনুপাতে খাজনা বাড়াইতে পারেন; কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি নাই।

লোক বৃদ্ধি হইলেই যে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং সেই নিমিত্ত খাজনা বৃদ্ধি হইবে এরূপ নহে। ইংলণ্ডের গোধূমের দরের যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ১৮৪০ খ্রী অব্দের যে দর ছিল ১৮৯৪ খ্রী প্রায় তাহার অর্দ্ধেক হইয়াছে। ইংলণ্ডে গোধূম উৎপন্ন না হইলেও অন্যদেশে বিঘাপ্রতি অধিক ফসল ও মালের সুলভে পরিচালনই ইহার একমাত্র কারণ। অথচ যে সকল দেশে গোধূম উৎপন্ন হইতেছে, তথায় খাজনা হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে কারণ ক্রমিকই অধিকতর স্থানে চাষের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত মানভূম ও সিংহভূম প্রদেশের জমির খাজনা সেলামীবাদে বিঘাপ্রতি একআনা হইতে চারিআনা পর্য্যন্তও দেখা যায়। তথাপি এই দুর্ম্মূল্য দেশের প্রজারা এই স্থান ত্যাগ করিয়া সেই সকল সুলভ স্থানে যাইতে ইচ্ছুক নহে। এদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে বঙ্গদেশীয় জমিদারও কত জমি পতিত রাখিতেছেন তথাপি খাজনার পরিমাণ হ্রাস করিবেন না। যে জমিদারের সকল জমিই প্রজাবিলিতে আছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথায় মঙ্গলময়; কিন্তু যেখানে অনেক জমি পতিত আছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় তথায় দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে না।

কলিকাতার দশ বার ক্রোশ দূরে গঙ্গার ধারে অনেক কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সেই সকল কলে বেতন স্বরূপ অধিক অর্থ পাওয়াতে তৎ-প্রদেশস্থ প্রজাবর্গ জমি ছাড়িয়া কলে কাজ করিতেছে; ইহাতে দ্রব্য-সামগ্রী অধিক মহার্ঘ হইলেও তাহারা অধিক বেতন পায় বলিয়া ক্ষতি-গ্রস্ত হয় না। জমিদারগণ ঐ সকল কলওয়ালাদের নিকট অধিক

খাজনা পাইলেও প্রজাগণের ত্যক্ত জমির খাজনা হ্রাস করিতেছে না—করিলে অল্প খাজনায় সেই সকল জমি অনায়াসে বিলি হইয়া যাইত এবং তৎসমুদায়ে বিস্তর শস্য উৎপন্ন হওয়াতে দেশে দ্রব্যসামগ্রী সুলভ হইত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে জমিদারকে খাজনার জন্য ভাবিতে হয় না। তাঁহারা কলওয়ালাদের কাছে যাহা পান, তাহাতেই তাঁহাদের দেয় খাজনা বাদে লাভ থাকে; সেইজন্য তাঁহারা পতিত জমি সস্তায় বিলির উপর দৃষ্টি করেন না। পতিত জমির উপর সরকার হইতে কর ধার্য্য না হইলে বোধ হয় আর জমিদারগণের চৈতন্য হইবে না। বণিক-সভা এই বিষয়ের আন্দোলন করিলে ঐ সকল জমির উদ্ধার হইতে পারে এবং তদুৎপন্ন ধনের বিনিময় করিয়া তাঁহারা লাভবান্ হইতে পারেন। সেই সঙ্গে দেশের ধনোৎপত্তি ও লোকপ্রতিপালনও হইতে পারে। অবশ্য এই সকল স্থানের শ্রামিকগণ কলকারখানায় অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ পাওয়াতে ঐ সকল জমি ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু জমিদার একটু বিবেচনা করিয়া তৎসমুদায়ের খাজনা কমাইয়া দিলেই অন্য গ্রাম হইতে শ্রামিক আসিয়া তথায় চাষবাসের অনুষ্ঠান করিতে পারে। তবে পতিত জমির উপর কর বসাইলে এই হয় যে, জমিদারগণ জমি পতিত না রাখিয়া অল্প হারে তাহাদের বিলি করিবেন, নচেৎ নিজেরা কৃষিকলেজের শিক্ষিত যুবকগণ দ্বারা উন্নত প্রণালীতে চাষবাসে মনোনিবেশ করিয়া কাঁচা মালে দেশ পূর্ণ করিয়া দিবেন এবং তদ্দ্বারা ধনোৎপাদনে সহায়তা করিবেন।

(৪) ব্যাবহারিক শিল্পবিষয়িণী শিক্ষার বিষয় বিস্তারিত বলিবার আবশ্যকতা নাই। ব্যাবহারিক শিল্পের হাতে কলমে শিক্ষাবিস্তার না হইলে শিল্প দ্রব্য অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে না। এই যে দেশীয় কাঁচা মাল বিদেশে গিয়া প্রস্তুত মালে পরিণত হইতেছে, উহাকে এ দেশে প্রস্তুত মালে পরিণত না করিলে দেশে ধনাগম হইতে পারে না।

যাহারা শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াও শিখিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সকলে শিল্প শিক্ষা করিয়া ধনোৎপাদনে পারদর্শী হইবেন। যে সকল পণ্য দ্রব্য স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার কঠোর পরীক্ষায় স্থিতি লাভ করিয়াছিল, আজ কাল অধিকতর কাট্‌তির নব বলে বলীয়ান হইয়া নব শিল্পীদের বুদ্ধিমত্তায় ব্যয়পরিমাণ সংক্ষেপিত ও অল্প লাভে প্রস্তত হইয়া অবাধ বাণিজ্যের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে। যে সকল দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া আজ উহা দেশে প্রস্তত করিতে সকলেই ব্যস্ত ও চিন্তিত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কথা ধনবিজ্ঞান পাঠে বোধগম্য করিয়া ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদন বা প্রস্তত করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলে টেক্‌নিক্যাল স্কুলের অধিক বেতনভোগী বিদেশীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত হইবার সুবিধা পাইলে তবে বাঙ্গালী যুবক উহার অভাব মোচন করিতে পারিবে। ছোট ছোট আদর্শ কলে কাপড়, দেশলাই, কাচের বাসন, তৈজস ইত্যাদি অল্প অল্প পরিমাণে প্রস্তত করিতে করিতে তবে বাঙ্গালী মূলধনের আন্দাজ পাইবে, ব্যয়-সংক্ষেপ শিখিবে, কাঁচামালের রূপান্তর করিতে শিখিবে, নচেৎ অসম্ভব। এইরূপে শ্রামিকদের কর্ম্ম-সংস্থান হইবে।

এই সুবিপুল ভারত সাম্রাজ্যে এখন কর্ম্মকর্ত্তার আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। যে ক্ষেত্রে পূর্ব্বে একজন চাষবাস করিত, এখন তাহা দশজনের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব এই দশজনের প্রত্যেকেই আরও দশগুণ জমী চাষ করিতে পারে বা উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সেই জমী হইতে অধিক ধনোৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু দশগুণ জমীর খাজনা দিবার ক্ষমতাও তাহার নাই বা উন্নত কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করিবার তদুপযুক্ত মূলধনও তাহার নাই। অধিকন্তু পৈত্রিক স্থান ত্যাগ করিতে তাহারা অনিচ্ছুক। নচেৎ কর্ম্মকর্ত্তারা কোন স্থানে অধিক ভূমি লইয়া তাহাদিগকে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নিযুক্ত

করিলে দেশের উৎপন্ন মালও বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা বুদ্ধিকৌশলে দশগুণ কর্ম্ম করিয়া সেই পরিমাণ উৎপাদিত সামগ্রীর ভাগ লইতে পারে ও বেতন বৃদ্ধি করিতে পারে।*

কোনও গ্রামে একঘর গোয়ালা দেখা গেল। গোয়ালা বেলা নয়টা পর্য্যন্ত বারটী ভিন্ন ভিন্ন বাটীতে দুগ্ধ দোহন করিয়া মাসিক ছয় টাকা মাত্র পায়; তাহার স্ত্রী চাকরী করিয়া মাসিক তিন টাকা পায় ও বেলা তিনটার সময় দুই তিন বাটীতে বাসন মাজিয়া বাটী আইসে; সেই জন্য গোয়ালা স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করে। গোয়ালা কিন্তু এক স্থানে পাইলে হয়ত বেলা নয়টার মধ্যে চব্বিশটী গাভী দোহন করিতে পারে এবং তাহার স্ত্রী অন্নপাক করিয়া দিলে বারটী গাভীর সেবাও করিতে পারে। তাহার স্ত্রীকেও সেইরূপ নানাস্থানে কাজ করিয়া বেড়াইতে না হইলে সেও চব্বিশটী গাভীর গোময়ের ঘুঁটিয়া দিতে পারে। ঘরের গাভী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ও মূলধন নাই বলিয়া গোয়ালা তাহার সম্পূর্ণ কার্য্যসামর্থ্য দেখাইতে পারে না। কর্ম্মকর্ত্তার আবির্ভাব হইলে ঐ গোয়ালা ও গোয়ালিনী উভয়ে মিলিয়া আন্দাজ বিশ টাকা বেতন পাইবার মত কাজ করিতে সমর্থ হয় এবং কর্ম্মকর্ত্তা উহাদিগকে বিশ টাকা বেতন দিয়াও লাভ পাইতে পারেন। কর্ম্মকর্ত্তার অভাবে এই সকল লোক নিজ নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কল-কারখানায় কার্য্য করিতেছে; অথবা যেখানে কল কারখানা নাই, সেই সকল স্থানে থাকিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ অনুভব করিতেছে। ইহারা নিজ নিজ প্রবৃত্তি বা সামর্থ্যমত কার্য্য করিতে পাইলে, বহু সামগ্রী উৎপাদন ও প্রস্তুত করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি

* Let special pains be taken for the development of an honest, intelligent entrepreneur class who will be content to organise and manage our new industries without sapping their life by demanding exorbitant profits—H. H. The Gaekwar's inaugural address. The I. I. Conference

এবং সেই অনুপাতে নিজেদের বেতন বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহাদের কাজ কর্ম্ম বন্ধ হওয়াতেই শাক শব্জী ও দুগ্ধ এত মহার্ঘ হইয়াছে। ইহারা কলে কাজ করিয়া অধিক অর্থ পাইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও ইহাদের বেতন বৃদ্ধি হইতেছে না, অথবা সেই অর্থে পূর্ব্বের মত অধিক সামগ্রী ভোগ, করিতে পাইতেছে না।

দেশবাসীর অন্ন সংস্থান ও অন্ন সংস্থান বাদে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্ত সামগ্রী ক্রয় করিবার সামর্থ্য আছে কি না, তাহা সমাজের লক্ষ্য স্থল। জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমাজগত স্বার্থ কখনই এক হইতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া আসাম দেশে যে এণ্ডী অথবা ভাগলপুর অঞ্চলে যে বাফ্‌তা প্রস্তুত হইতেছে, উহা কখনই সমাজগত স্বার্থের অনুমোদিত হইতে পারে না। মহাজনের দাদনে প্রস্তুত হইয়া এই কাপড়গুলি অনেক হাত ফিরিয়া কলিকাতায় বড় বাজারে আসিতেছে এবং বিদেশী বণিক ইউরোপ ও আমেরিকায় গতিকেই এখানকার দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিতেছ। এই যে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, উহা কয়েকজন মাত্র মহাজনের স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। এই বস্ত্র সস্তায় বিক্রয় করিতে হইলে মহাজনদের লাভ অল্প হয় অথচ এই বস্ত্র সস্তায় বিক্রীত হইলে কাটতির আধিক্য অনুসারে বহুসংখ্যক দেশবাসীর অন্নের সংস্থান হয়। ফলকথা দশ হাজার গজ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রীত না হইয়া শ্রম বিভাগে ও সমবেত মূলধনে পঁচিশ হাজার গজ ঐ মূল্যে বিক্রয় হওয়া সম্ভবপর হইলে আড়াই গুণ অধিক শ্রামিকের কর্ম্ম-সংস্থান হয়। কিন্তু পঁচিশ হাজার গজ ঐ মূল্যে বিক্রয় করায় লাভের সমষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে কি কম হইবে, ইহার ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছুক বলিয়া মহাজনেরা এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। তাহাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী লাভ প্রাপ্তিই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। উহা যদি অল্প পরিমাণ সামগ্রী হইতে তাহা-

দের পাওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে অধিক সংখ্যক লোকের কর্ম্ম-সংস্থান-চিন্তা তাহাদিগকে যে বিচলিত করিবে, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। সমাজ-স্বার্থ নিজে ইহাকে পরিপোষণ করিবে। সমগ্র সমাজের সমবেত চেষ্টা এইরূপ দ্রব্য বিশেষের উৎপাদনে নিয়োজিত হইলে দ্রব্যাদি সুলভে প্রস্তুত হয় এবং কাটতির আধিক্যে শ্রমজীবীরা সুখে কালাতিপাত করে।

ভারতবর্ষে অল্পকালস্থায়ী সামগ্রীর ব্যবহার কখনই ছিল না। এদেশের তৈজসপত্র বহুকালস্থায়ী ও গৃহস্থের ধন বিশেষ। ইয়ুরোপের কাচের বাসন অতীব ভঙ্গুর। এদেশের কার্পেট বা কাশীর পিতলের বাসন, বা কাশ্মীরের শাল বহুকালস্থায়ী ও দেখিতে সুন্দর বলিয়া ইয়ুরোপীয়গণ সখের জন্য স্ব স্ব দেশে লইয়া যান। এই সখের সামগ্রী ইহাদের ধন সম্পত্তিরূপে গণ্য, কারণ বহুকাল ব্যবহারের পর বিক্রয় করিলে অনেক সময় তিন ভাগ টাকা উঠিয়া আইসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী পরম ব্যবহারোপযোগী ধন সামগ্রীর ভোগ করা ভারতবাসী সমীচীন বোধ করে না; সেই জন্য ঐ সকলের উৎপাদনে ভারতবাসীর এখন আর তত আসক্তি নাই। একেত তাহারা ধনোৎপাদনে পশ্চাৎপদ, তাহার উপর আবার ক্ষণকালস্থায়ী দৃশ্যমনোহর সামগ্রী নিজেদের ধনের বিনিময়ে গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ধন উৎপাদিত হয়, ভোগান্তর তাহার সামান্য অংশও দেশে থাকে কি না সন্দেহ;—যদি থাকে, তাহা হইলে এক বৎসর ফসল না হইলেই বা নষ্ট হইলেই দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে কেন? ইংরাজের ভোগবাসনা আমাদের অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহাদের ধনোৎপাদনের গৌরবে সমস্তই শোভা পায়। যাহাদের কৃষি ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, এবং যেদেশে প্রস্তুতিকল্পে বিত্তবান বা কর্ম্মকর্ত্তার আবির্ভাব নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহাদের চাষার মত ভোগ-

বাসনা হওয়া উচিত। দরিদ্র লোক বড় লোকের অনুকরণ করিতে গিয়া অধঃপতনের পন্থা পরিষ্কৃত করে মাত্র। উৎপাদিত ধনের অনুপাতে ভোগের খরচ অল্প হইলেই দেশের অবস্থা উন্নত হয় বলা যায়। ইংলণ্ডে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে যে পরিমাণ ধন উৎপাদিত হইতেছে, ভারতবর্ষে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে তাহার অনেক অল্প ধনের উৎপত্তি হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে ভারতবাসীর ভোগবাসনা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু ধনোৎপাদন-বাসনা বৃদ্ধি পাইতেছে না। তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছে। প্রত্যেক ভারতবাসীই অবশ্য একথা স্বীকার করিবে যে, কেবল দ্রব্যাদির পণ বাড়িতেছে, এমত নহে, বহুবিধ দ্রব্যের ভোগবাসনাও বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে যে কৃষক মৃত্তিকার মধ্যে মৃৎপাত্রে নিজের টাকা রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইত, আজি কালি পাট ও শস্য বিক্রয়ের পর একটী রঙচঙে টীনের ক্যাশ বাক্সে সে এখন টাকা রাখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিশ্চিন্ত হইতেছে। এরূপ অধিক নিশ্চিন্ত হইবার যে কোনই কারণ নাই, তাহা সে একবার নিজে ভাবিয়া দেখিতেছে না, অপরেও তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে না।

সকল বিষয়ে ভারতবাসী নানাবিধ দ্রব্য ভোগ করিয়া অধিক ব্যয় করিতে এক প্রকার কৃতসঙ্কল্প। লোকে কথায় বলে "রোজগার নাই, বাবুয়ানী আছে।" সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষেএই কথা প্রযোজ্য। চটের কলে ছুটীর সময় একবার যাইলেই দেখা যাইবে, শ্রামিকদের গায়ে রঙিন জামা, উড়াণী, পায়ে মোজা জুতা, মুখে সিগারেট। আহারীয় দ্রব্যের পণ বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার অর্থপরিমিত বেতন বৃদ্ধিতে যথার্থ বেতন বৃদ্ধি হয় নাই; অধিকন্তু জুতা জামা ইত্যাদির ভোগবিলাসে তাহাদের ধন নাশ হইতেছে। সভ্য জগতে বাতি জ্বালিতে ও অন্যান্য বিষয়ে দেশলাই আবশ্যক হয়, কিন্তু দেশলাইয়ের অভাবে চাষীর বিশেষ ক্ষতি হয় না। দুই চারিটী দেশলাইয়ে তাহার সংবৎসরের আবশ্যক কার্য্য সিদ্ধ হইতে

পারে। চক্‌মকি ব্যবহার না করিয়া সে মাসিক দুই আনার হিসাবে এক মণ ধান্যের বিনিময়ে এক বৎসরের দেশলাই ক্রয় করিয়া থাকে! ইংলণ্ডের লোকপ্রতি বার্ষিক আয় বিয়াল্লিশ পাউণ্ড, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রায় দেড় পাউণ্ড বা পনর মণ ধান্য!

যে দেশে, যে সময়ে যে অবস্থায় যাহার যে দ্রব্য ভোগ করা বিলাসিতা বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার সেই দ্রব্যে ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইলে তাহার ধনের অপব্যয় হয় না। মিত্যব্যয় বলিলে অনেকে সঞ্চয়ের ভাবও অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু মিতব্যয় বাস্তবিক ব্যয় বিশেষের নাম। অল্পকালভোগসাধ্য সামগ্রীর অধিক ব্যয়ের নাম অমিত ব্যয়। আহারীয় ও পানীয় একবার মাত্র ভোগে বিনষ্ট হয়, অতএব অনাবশ্যক অধিক মূল্যের ঐ জাতীয় সামগ্রী ভোগের নাম অমিত ব্যয়। নিতান্ত আবশ্যক এবং অপরিহার্য্য সামগ্রী বিশেষ, যাহার ভোগান্তেও কিছু পাওয়া যায়, অথবা যাহা সম্পত্তিরূপে পরিণত করা যাইতে পারে, উৎপন্ন ধনের বিনিময়ে ঐ সকল সামগ্রী গ্রহণ করাই মিতব্যয়। এই মিতব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের (internationl trade) অনুমোদিত বাণিজ্যিক দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যক্তিমাত্রই নিজ নিজ কলা বিশেষের সামর্থ্যানুযায়ী পরিচয় দিতে পারিলে এবং বাস্তবিক ধর্ম্মভীরু কার্য্যক্ষম কর্ম্মকর্ত্তার (untrepreneuer) আবির্ভাব হইলে যতই দেশের অধিকাংশ শ্রামিকের শ্রমবিভাগে কার্য্য-সামর্থ্যের সম্পূর্ণ বিকাশ পায়, ততই দেশে অধিক ধন উৎপাদিত হইতে থাকে এবং শ্রামিকেরও কর্ম্মসংস্থান হইয়া তাহার অবস্থান্তর ঘটে।

বঙ্গদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর অবস্থান্তর ও তন্নিরাকরণের উপায়।

মানবমাত্রই নিজ নিজ অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত তদুপযোগী সামগ্রী ভোগ করিতে উদ্যত হয় এবং স্ব স্ব সমাজের নিয়মিত ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া আপনাকে সমাজস্থ ভাবিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। জগতের ভিন্ন ভিন্ন লোকের যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন বা আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয়। সেই প্রয়োজন সাধন করিতে এবং অন্নপ্রাশন, বিবাহ শ্রাদ্ধাদি যে সকল সামাজিক প্রথা দেশবিশেষে প্রচলিত আছে, তৎসমুদয়ের অনুসরণে সমাজবিশেষে সকলেই যথাসাধ্য উদ্যম করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিবিধানে এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সম্পাদনে সক্ষম, তাহাকেই সকলে ধনী বলেন। যে সমাজে এই জাতীয় লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেই সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে বুঝিতে হইবে। এখন আমাদের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ক্রিয়াকলাপের অভাব নাই। কিন্তু ক্রিয়াকলাপের সম্পাদনান্তে বাহ্য আড়ম্বর হেতু ব্যয়াধিক্য বশতঃ অনেকেরই মুখমণ্ডলে নৈরাশ্য ও স্তিমিতভাব পরিদৃশ্যমান। জগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন সমাজের ঐরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, আবার কোন কোন সমাজ বিপরীত বিধির অনুবর্ত্তন করিয়া একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন না কোন নিয়মের অনুসারে সামাজিক শ্রীর হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রত্যেক সমাজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উদ্যোগী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কায়িক পরিশ্রম করিতেছে এবং যাহার জন্য পরিশ্রম করিতেছে, তাহার নিকট তদ্বিনিময়ে কোন সামগ্রী, বা সামগ্রী দাবী

করিবার স্বত্ব, বা অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে। যাহার জমি নাই, সে জমিদারকে জমি-ব্যবহারের বিনিময়ে কিছু দিয়া পরিশ্রম-সাহায্যে সামগ্রী উৎপাদন করিতেছে। যাহার জমিও নাই, অর্থও নাই, সে ব্যক্তি জমিদার ও মহাজনকে তাহাদের প্রাপ্য দিয়া নিজের প্রয়োজন অনুসারে চাষ, আবাদ বা খনি হইতে ধাতু উত্তোলন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কেহ বা এই উৎপন্ন সামগ্রী অন্য স্থানে লইয়া তাহাকে অধিক মূল্যযুক্ত করিয়া লাভবান্ হইতেছে, কেহবা সামগ্রী রূপান্তরিত করিয়া বা অধিককাল মজুত রাখিয়া অধিক মূল্য লইতেছে। আবার কেহ বা উৎপন্ন বা প্রস্তুত সামগ্রীর গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া ঐ সামগ্রীর অংশ বা তুল্য মূল্য অর্থ গ্রহণ করিতেছে। কেহ বা ওকালতী বা চিকিৎসা করিয়া বা বিদ্যাদান প্রভৃতি কার্য্যের বিনিময়ে অর্থলাভ করিতেছে। ফলতঃ যে ব্যক্তি যে পরিমাণে সামগ্রী ভোগ করিয়া বা সঞ্চয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তৎসমস্তই বিনিময়সম্ভূত। যে ব্যক্তি কেবল কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে উদরান্নের সংস্থান করিতেছে, উহা তাহার কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত হইতেছে। যে ব্যক্তি উদরান্নের সংস্থান করিয়াও পরিধেয় ব্যবহার করিতেছে, এবং যে ব্যক্তি স্বীয় অভাবমোচন বা বিলাস-বাসনার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত আরও নানাবিধ সামগ্রী ভোগ করিতেছে, ইহা অবশ্যই কোন না কোন সামগ্রীর বিনিময়ে সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

যে ব্যক্তি উদ্যম ও অধ্যবসায়গুণে বা পরিশ্রম করিয়া, অথবা স্বকীয় পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য সামগ্রী ভোগ করিয়া জীবনসংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, তাহার সেই অবলম্বিত বৃত্তিকে বঙ্গভাষায় ব্যবসায় বলা যায়। কোন ব্যক্তির কি ব্যবসায়,—এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কি করেন, ইহাই বুঝায়। বস্তুতঃ ব্যবসায় কথার মৌলিক অর্থ ধরিলে—যথা বি-অব-সো (উদ্যোগ করা, শেষ

করা) বিশেষরূপে উত্তমকরণ, অথবা শেষ পর্য্যন্ত উত্তমকরণ বুঝায়। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"—অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করিয়া থাকেন। ইহা একটী মহাজনবাক্য। বিনিময়প্রধান সমাজে উদ্যোগী পুরুষদের সমস্ত কার্য্যই বিনিময়-সম্ভূত। এই বিনিময় ব্যাপারে কি প্রকারে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর কর্ম্ম সামর্থ্য নিয়োজিত হয় তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ওকালতী বা চিকিৎসা বা বিদ্যাদান বা ভিন্ন জাতির কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করিয়া তদ্বিনিময়ে তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। ধনাগমের অন্যান্য অতিশয় প্রশস্ত কোন পন্থায় তিনি বিচরণ করিতে পশ্চাৎপদ। হাতে কলমে ব্যাবহারিক শিল্প বিদ্যায় তিনি কোন কালেই পারদর্শী ছিলেন না। বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষা করিতে তিনি অনিচ্ছুক, কারণ ভদ্রলোক অনেকে ব্যবসা করিয়া লোকসান দিয়াছেন। এই সুজল সুফল রত্নগর্ভ বঙ্গদেশে যে পরিমাণ ধন সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয়, তাহাতে আমাদের কি পরিমাণ অংশ বর্ত্তায় তাহা সহজেই অনুমেয়। বড় মুদিখানায় মুহুরীর যে অংশ আছে, বড় বড় সদাগরী আফিসে আমাদেরও সেই অংশ বর্ত্তমান। আমরা বঙ্গদেশের উৎপন্ন ও প্রস্তুত ধনের ভাগীদার হইতে যে পন্থা অনুসরণ করিতেছি, সে পথের পথিকে আজ দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। মালের টান ধরিলে এবং যোগান কমিলে দ্রব্যের মূল্য বাড়ে, কিন্তু টান অপেক্ষা যোগান অধিক হইলে মূল্য কমে। তাই আজ কুড়ি টাকার চাকরি খালি হইলে আবেদন পত্রে আফিস ঘর পূর্ণ হইয়া যায় এবং বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যায় না। অন্যান্য সামগ্রী সস্তা হইলে লাভ কম দেখিয়া উহার যোগান আবার কমিয়া যায় ও পরে যত দিন না উহার মূল্য বাড়ে, তত দিন কেহ সে মাল বাজারে পাঠাইতে চাহে না; কিন্তু চাকুরে রূপ মালের আর যোগান কমিতেছে না। এ মালের অভাব আর অনুভূত হইতেছে না।

কেবল বড় লোকের কন্যার বিবাহের সময় ইহাদের অধিক মূল্য পাই-বার সম্ভাবনা দেখা যায়।

যে পন্থা আমরা অনুসরণ করিয়াছি, তাহারই ফলে গতিকে আমরা পল্লীত্যাগ করিয়াছি। অতএব পল্লীর ধন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। বাগানে তরকারি দিয়া যাহা বিনামূল্যে পাইতাম, পুষ্করিণীতে মৎস্য ছাড়িয়া যাহা ছিপে ধরিতাম, নারিকেল তাল যাহা পয়সা দিয়া কিনি নাই, গৃহের গোধন যাহার খাটি দুগ্ধ হইতে ক্ষীর সর নবনীত খাইয়া মস্তিষ্কের বলাধান হইত ; আজ সেইগুলি পরিশ্রমের বিনিময়ে লব্ধ ধন নাশ করিয়া ক্রয় করিতেছি। পল্লী ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর প্রেতাত্মা শ্মশান হইতে বলিয়া দিতেছে "যে অর্থের নিমিত্ত দেশ ত্যাগ করিয়াছ, তাহার অধিকাংশ না দিলে আর পূর্ব্বের মত খাদ্য সামগ্রী পাইবে না।" বাবুরা যখন পল্লীতে থাকিতেন কৃষক ধান্যের সহিত তরিতরকারী উৎপন্ন করিয়া লাভবান হইত। এখন সেই লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবল ধান্যে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে তাহারা অক্ষম। তাই সে আজ বিদেশী বণিকের ক্রয়সামর্থ্য প্রার্থনা করি-তেছে—নচেৎ ইহার উপর চাউলের মূল্য কমিলে তাহাকে চাউলের ব্যবসায়ে ইস্তফা দিতে হইবে।

কি অদ্ভুত নিয়ম! দেখিতে দেখিতে অর্থের মূল্য হ্রাস হইয়া গেল, আর পূর্ব্বের অর্থে পূর্ব্বের মত সামগ্রী পাওয়া যাইবে না। বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের বিনিময়ে যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাদ্বারাই ঐদ্রব্যের মূল্যজ্ঞাপন করা হয়, অতএব অর্থের মূল্যজ্ঞাপন করিতে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয় ; যেহেতু অর্থই মূল্যজ্ঞাপক এবং ইহার পণ নিরূপণ-কারী মধ্যস্থ কোন কিছুই নাই। সাধারণতঃ দ্রব্য-সম্ভারের পণের তারতম্যানুসারে অর্থের মূল্য নিরূপণ করা যাইতে পারে ; কারণ দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধই উহার মূল্য। এবং অর্থও যখন ধাতুজ পণ্যদ্রব্য

বিশেষ, তখন ঐ অর্থের পরিবর্ত্তে যে পরিমাণ চাউল বা যে পরিমাণ তৈল পাওয়া যাইবে, উহাই অর্থের মূল্য স্বরূপ। যদি এক মণ চাউল বা দশসের তৈলের পরিবর্ত্তে অল্প অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে অর্থের মূল্য অধিক হইয়াছে এবং যদি এক মণ চাউল বা দশ সের তৈলের পরিবর্ত্তে অধিক অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইলে অর্থের মূল্য হ্রাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব অর্থের দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিবার শক্তিই উহার মূল্য এবং দ্রব্যাদির মূল্য ও অর্থের মূল্য পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন। উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ তুলাদণ্ডের পাল্লার ন্যায়। যদি একটী উত্থিত হয়, অপরটী নিম্নগামী হইবে, এবং অপরটী উত্থিত হইলে অন্যটী নিম্নগামী হইবে।

কোন দ্রব্যের আমদানী অর্থে সেই দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, বুঝায়, কিন্তু অর্থের আমদানী হইয়াছে বা উহা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, এরূপ কথা সাধারণতঃ শুনা যায় না। প্রকৃতপক্ষে যখনই কোন দ্রব্য অর্থে ক্রীত বা অর্থ লইয়া বিক্রীত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে অর্থও ঐ দ্রব্যের ন্যায় ক্রীত বা বিক্রীত হইয়া থাকে। যখন কেহ শস্য বা তুলা বিক্রয় করেন, তখনই মুদ্রা ক্রয় করেন এবং যাঁহারা ঐ গুলি ক্রয় করেন, তাঁহারা বিক্রেতাগণকে অর্থ বিক্রয় করেন।

এই ত আমাদের "পন্থা ও পাথেয়।" পথিকের সংখ্যা অধিক বলিয়া পাথেয় আর অধিক পাওয়া যাইতেছে না; তাহার উপর ইহার ক্রয়কারিণী শক্তির কি অসম্ভব হ্রাস। এখনও কি এই অল্প মূল্যের সামগ্রী প্রাপ্তির নিমিত্ত আমাদের এই পথ অনুসরণ করা উচিত? অন্যান্য যে সকল দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বাড়িয়াছে সেইগুলির উৎপাদন ও প্রস্তুতিকল্পে আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত? আমরা দেখিতেছি যে আমাদের দেশে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে অধিক ধন সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে না বলিয়া দেশের মূলধন বৃদ্ধি পাইতেছে না ও সুদ কমিতেছে

না। আমরা আরও দেখিতেছি যে চরিত্রের গঠন হয় নাই বলিয়া আমাদের বাজার-সম্ভ্রম অল্প। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া পালন করিতে না পারিলে আমরা সমাজে ক্ষতিগ্রস্ত হই না, এই জন্য প্রতিজ্ঞা-পালনে চেষ্টা করি না। আমাদের বাজার সম্ভ্রম অল্প বলিয়া অমরা অল্প সুদে বিদেশী মূলধন (কল কব্জা ইত্যাদি ধন সামগ্রী) ধারে ক্রয় করিতে পাই না। এইরূপ স্থলে সমগ্র সমাজের এই উদ্দেশ্যে সমবেত চেষ্টা ধনোৎপাদিনীশক্তির অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই শক্তির বলে ব্যক্তিগত স্বার্থ এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে দেশের অধিক মূলধন সৃষ্ট হইতে পারে অথবা বহু সংখ্যক লোক কার্য্য বিশেষে শ্রম-বিভাগ প্রথায় নিযুক্ত হইয়া উৎপন্ন ধন সামগ্রীর অংশ গ্রহণ করিয়া অন্য পথগামী হইতে পারে।

এই অল্পক্রয়কারিণী শক্তি উপার্জ্জন করিয়া তদ্বিনিময়ে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে আমরা ভোগের অথবা শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্ত যে সকল সামগ্রী ক্রয় করি, সেগুলি হইতে বিশেষ কোন ফল পাই না।

আমাদের সমাজ এখন নিত্য নূতন ভাব ধারণ করিতেছে। সমাজস্থায়িত্ব নামে শাশ্বত বা চিরন্তন। কালের প্রভাবে সমাজে নূতন ভাব পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক ব্যক্তি মাত্রেরই কার্য্যপরম্পরার ফলসমষ্টি সমধর্ম্মান্বিত হইয়া মঙ্গলের দিকে প্রধাবিত হইলে সেই সমাজে শ্রী পরিলক্ষিত হয়, এবং বিপরীত বিধির অনুবর্ত্তনে সমাজ-শ্রী দূরে চলিয়া যায় এবং সামাজিক ব্যক্তি মাত্রের মুখে নৈরাশ্য ও স্তিমিতভাব পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। আমাদের এই সমাজে উহা সম্পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে।

অল্প বয়সে বিবাহ হইলে অল্প বয়সেই জনক জননী হইতে হয়। ইহাদের পুত্র কন্যাগুলি যে দুর্ব্বল ও মেধাহীন হইবে, তাহাতেই বা সন্দেহ কি? এবং দুর্ব্বল ও মেধাহীন বালকবালিকা দ্বারা আর্য্য জাতির গৌরব

যে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। অতএব দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা যুবকদের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যে স্বাবলম্বনে অভ্যস্ত না হইয়া বিবাহ করা উচিত কিনা তাঁহারা যেন একবার চিন্তা করিয়া দেখেন। অল্প বয়সে বিবাহ দিবার বাসনা-স্রোত বিপরীতগামী করিতে তাঁহারাই একমাত্র সমর্থ। সামাজিক ব্যক্তি মাত্রের কার্য্য পরস্পরা সমর্থর্ম্মান্বিত করিতে আমরা তাহাদেরই মুখপানে চাহিয়া থাকি।

সামাজিক ক্রিয়াকল্পে অপব্যয় ও কৃত্রিম দান সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। নামকরণ, উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে সমাজের ব্যক্তিগণের মিলন হইয়া থাকে এবং সামাজিক উন্নতিকল্পে অথবা সমাজবন্ধন দৃঢ় রাখিবার উদ্দেশে এরূপ মিলন যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা বোধ হয় সমাজপ্রিয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। এই সকল উপলক্ষে যাহার বাটীতে মিলন হইয়া থাকে, তাহাকে অবশ্য ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। এই ব্যয়ের সহায়তাকল্পে পরস্পরের সাহায্য আবশ্যক বলিয়া লৌকিকতার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন যে লৌকিকতা দেওয়া হয়, তাহা একপ্রকার অপব্যয়, কারণ ব্যয় করিয়া যে সামগ্রী উপঢৌকন দেওয়া হয়, উহার উপযোগিতা কি? পাকস্পর্শে বা শ্রাদ্ধে যে প্রকারের কাপড় দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে কয়খানি ব্যবহারযোগ্য? সমাজের যে পরিমাণ অর্থ এই অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য-সংগ্রহে ব্যয়িত হয়, তাহাতে কি কর্ম্মকর্ত্তাদের কোন উপকার সাধিত হইতে পারে না? অবশ্য বাহককে অল্প বিদায়ের ব্যবস্থা করিয়া সমাজ কথঞ্চিৎ বহুদর্শিতার আভাস দিয়াছে, কিন্তু মূল অপব্যয়ের কি কোন প্রতিকার নাই? তুল্যমূল্য অর্থ কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির সহায়তাকল্পে কি ব্যয়িত হইতে পারে না? পরে যে অধিক মূল্যের সামগ্রী জামাতাকে দেওয়া হয়, বাস্তবিক কয়জন জামাতা তাহা পাইবার উপযুক্ত? যদি ভবিষ্যতে তিনি নিজে স্বাবলম্বন শিক্ষার

পূর্ব্বে উহা ক্রয় করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাহাকে বহুমূল্য বস্ত্রো-ত্তরীয় পাদুকা ও বিলাস দ্রব্যে অভ্যস্ত করাইয়া লাভ কি? এই হঠাৎ পরিবর্ত্তন জানিয়া পরে তাহার অভাব অনুভব করা কি অকারণ দুর্ব্বহ ক্লেশভার বৃদ্ধি করা নহে?

"ওঁ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিতে হয় বলিয়া কি আচ্ছাদন ও অলঙ্কারের মূল্যের কথা ব্যক্ত আছে? এক ব্যক্তির সংসারের উপকারকল্পে যে কন্যাদান বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা কি যথেষ্ট নহে? কারুণ্যের উদয়েই ত দান হইয়া থাকে—এই দানের উপর জুলুম কেন?

একেই ত আমাদের এই হতভাগ্য সমাজে ধনীর সংখ্যা অতীব অল্প, এবং বর্দ্ধিষ্ণু দুই চারি ঘর গৃহস্থ ব্যতীত দরিদ্রের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যখন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য অল্প ছিল, যখন বেশভূষা ও বাহ্য আড়ম্বর অপব্যয় মনে করিয়া পূর্ব্বেকার গৃহপতি গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধ ও গোলাজাত ধান্যে পরিপোষিত হইয়া নিজ ব্যবসায়ে ভবিষ্যৎ ধনাগমের পন্থা উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেন, যখন উৎপন্ন ধনের মিতব্যয়িতা জানিতেন অর্থাৎ পরিশ্রমলব্ধ ধনের বিনিময়ে এরূপ ধন গ্রহণ করিতেন যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অথবা যাহার ভোগান্তেও মূল্য পাওয়া যাইত বা যাহা সম্পত্তি রূপ মূলধনে রূপান্তরিত হইত, তখন সমাজের সেই সচ্ছল অবস্থায় যে সকল আচার ব্যবহার করিয়া লোকে কৃতার্থম্মন্য হইতেন, এখন এই দুর্দ্দিনেও আমরা ততোধিক ব্যয় করিতে একপ্রকার কৃতসঙ্কল্প! সমাজের এখনকার ভ্রান্ত নিয়মগুলি বিমূঢ়ের ন্যায় অনুবর্ত্তন করিবার আমাদের এই সিদ্ধান্ত যে জ্বলন্তবহ্নি শিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের সিদ্ধান্তের অনুরূপ অথবা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য বালকের কার্য্যপরম্পরার সমতুল্য, তাহাতে বোধ হয় কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

যিনি সন্দেহ করিতে কৃতসঙ্কল্প তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি এখন অর্থের মূল্য কি প্রায় এক তৃতীয়াংশ হয় নাই ? নিজ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ১০০ টাকা বেতনের চাকুরি গ্রহণ করিয়া আত্মীয়স্বজনের কৃতজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন, তাহাদের বংশধরগণ আজ কাল ৩০০ টাকায় তাহা লাভ করিতে পারেন না। দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু বেতন বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। এখন যিনি ২০০ শত টাকা পাইয়া থাকেন, বাস্তবিক তিনি পূর্ব্বেকার প্রায় ৬০ টাকা পাইতেছেন অর্থাৎ পূর্ব্বে ২০০ টাকায় যে পরিমাণ সামগ্রী পাইতেন এখন প্রায় তাহার এক তৃতীয়াংশ পাইতেছেন, এবং এখন যিনি পঞ্চাশ টাকা পাইতেছেন, বাস্তবিক তিনি পূর্ব্বেকার প্রায় ১৭।১৮ টাকা পাইতেছেন। আজকাল একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে শতকরা অধিক লোক ৫০৲ টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে সমর্থ নহেন। যে সমাজের অবস্থা এখন এইরূপ, সে সমাজে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ব্যয়-সংযম-বিধি প্রবর্ত্তিত না হইলে অধিক পরিবারে যে অশিক্ষিতের ও ভবিষ্যৎ জীবনসংগ্রামে অনুপযুক্ত ব্যক্তির অধিক আবির্ভাব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

সামাজিক ব্যক্তি মাত্রের কার্য্য পরম্পরার ফলসমষ্টিতে সমাজ শরীর গঠিত হয়। অতএব অধিক সংখ্যক ব্যক্তির অনুপযুক্ততা নিবন্ধন সমাজ-শরীর যে দিন দিন ক্ষীণ ও ভঙ্গুর হইবে তাহা আর বিচিত্র কি ? সামাজিক ব্যক্তি মাত্রকে উপযুক্ত করিতে মূলধন আবশ্যক এবং মূলধন ব্যয়-সংযমের ফল। অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক ব্যাপারে অপব্যয় হইলেই আবশ্যক কার্য্যে ব্যয় করিবার ধনসংস্থান শূন্য হয়। এ কারণে বিবাহের অর্থ সংগ্রহ করিতে গিয়া কন্যাকে ত শিক্ষা দেওয়াই হয় না, অধিকন্তু নিজ বংশধরের শিক্ষাতেও বাধা উপস্থিত হয়। অনেকে হয় বাল্য বিবাহের ফলে শীঘ্র উপার্জ্জন করিতে ব্যস্ত হওয়ায় নিজে শিক্ষালাভ করিতে

পারেন নাই, অথবা কর্ম্মের সাকল্যে শিক্ষিত হইলেও নিজে শিক্ষা দিবার অবকাশ পান না, অথচ বেতন অল্প এবং কন্যাদায়গ্রস্ত বলিয়া শিক্ষকও নিযুক্ত করিতে পারেন না। ইহা সামান্য অসুবিধা নহে।

আজ উক্ত অসুবিধা জন্য তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে যে কত অশিক্ষিত লোক বর্ত্তমান, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। এই কারণেই দুই একটী অনূঢ় শিক্ষিত যুবকের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনেককেই প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হয়। এই নিমিত্তই সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তিরা কন্যার বিবাহ দিবার সময়ে অধীর হইয়া পড়েন। ব্যক্তি মাত্রেরই সৎপাত্রে কন্যাদানের ইচ্ছা বলবতী হওয়া অবশ্য দোষের কথা নয়, বরং সামাজিক উন্নতির পরিচায়ক; কিন্তু এই ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত অভিলাষ পূর্ণ করিতে গৃহস্থ যাহাতে সর্ব্বস্বান্ত না হয়েন, তাহা কি সমাজের লক্ষীভূত নহে? স্বীকার করি আজি কালিকার এই ভীষণ জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত ব্যক্তিরাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, কিন্তু যোগ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করিলে, উপযুক্ত হওয়া কঠিনতর ব্যাপার বলিয়া অনুমিত হয়। মলিনমুখ, করতলন্যস্তগণ্ড, নৈরাশ্যে স্তিমিতহৃদয়, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, নিজ পুত্রকে জীবনসংগ্রামে বিজয়ী করিতে, কিরূপ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ, তাহা কি উপলব্ধি করা সুকঠিন?—এই দরিদ্রপ্রধান দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দেশে ভবিষ্যৎ ধনোৎপাদন ও নিজসংসারমঙ্গলসাধন কল্পে দরিদ্রের ব্যয়সংযমে ও বহু ক্লেশে সঞ্চিত অর্থ, যদি কন্যার সহিত অন্য গৃহে চলিয়া গেল, তাহা হইলে সে পরিবারের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কতটা আশা করা যাইতে পারে? একেই ত এই শ্রীহীন সমাজে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, তাহার উপর এই সমাজ-নিয়মে যদি দরিদ্রকে অধিকতর দরিদ্র করা হয়, এবং উল্লিখিত অপব্যয়গুলি সমাজানুমোদিত হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে উহাদের সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বিবাহের পূর্ব্বে স্বাবলম্বন * যে একটি অপরিহার্য্য অত্যাবশ্যক গুণ বলিয়া পূর্ব্বে বিবেচিত হইত, তাহা একেবারে আমাদের চিন্তাপথ হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছে। শাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক স্বাবলম্বন-শিক্ষার অভাবে শতকরা কত নবীন জনক যে কিরূপ কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাহা সহৃদয় অনেক পাঠকেই অবগত আছেন। গো-জাতির ধ্বংস হেতু দুগ্ধ ও অন্যান্য সামগ্রী মাহার্ঘ্য হওয়ায় কয়জন জনক তাহাদের পুত্রকন্যার শারীর ও মানসিক বলের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় আহার ও পানীয় দান করিতে সক্ষম? ডাক্তারগণ বলেন, ৫ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যা অপেক্ষা পুত্রের অধিক আহার্য্যের প্রয়োজন; এবং সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, যে এ দেশে অল্পবয়স্ক বালকদের মৃত্যুর হার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যে আহার ও পানীয় বলে বলীয়ান হইয়া ভবিষ্যৎ যুবক ধনোৎপাদনে সক্ষম হইবে, তাহার কিরূপ সংস্থান করিয়া যুবকগণ বিবাহ করিতে উন্মত্ত হয়েন? এই দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে অনর্থক মেধাহীন দুর্ব্বল সন্তান সন্ততির আবির্ভাবে সহায়তা করা কি স্বজাতির গৌরব-রক্ষার অন্যতম উপায় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? দরিদ্র পিতার

---

* যে জাতির উপনয়ন হয়, তাহাদের বিবাহের বয়স একপ্রকার বহুকাল হইতে স্থির আছে। গুরুর নিকট উপনীত হইলে (উপনয়ন) তাহাকে বেদ ও বেদাঙ্গাদি পড়িতে হইত। সেই নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাপন হইলে তাহার সমাবর্ত্তন হইত অর্থাৎ ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহে আগমন করিলে সমাবর্ত্তন ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। কিন্তু কি অসম্ভব পরিবর্ত্তন! এখন সেই দিবসে সেই অগ্নিকে সাক্ষ্য করিয়া শিষ্যকে যে সকল কথা বলান হয়, তাহা কি বাস্তবিক ধর্ম্মভীরুর কার্য্য? এখন তিন দিন ব্রহ্মচর্য্যায় ত্রয়ী-বিদ্যা শিক্ষা করা হয়, এবং একদিন ভিক্ষায় স্বাবলম্বন শিক্ষা হয়। পূর্ব্বে মহানাম্নীব্রত, গৌদানিকব্রত এবং আরণ্যক ব্রত সমাপনে রীতিমত স্বাবলম্বন শিক্ষার পর সমাবর্ত্তন ক্রিয়া সমাপিত হইত এবং সমাবর্ত্তনের পর যুবক বিবাহের উপযুক্ত হইত। তখনই ব্রহ্মচারী সংসারী হইবার পাত্র হইতেন। এখন কয়জন উপনয়নের পর দশ বার বৎসর শিক্ষা করে এবং শিক্ষার পর স্বাবলম্বনে অভ্যস্ত হয়?

এরূপ অসার সন্তানের আবির্ভাবে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুজাতির সংখ্যা যে, নিম্নশ্রেণীর মত ক্রমেই হ্রাস পাইবে এবং সেই সঙ্গে দেশের দুর্দ্দশা যে, ক্রমশঃ গভীরতর হইয়া পড়িবে ও অতৃপ্তির ভীষণ আর্ত্তনাদে দেশ যে, আলোড়িত হইবে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে সকল উপায় বিবৃত হইল, দেশে ঐ গুলির আবশ্যকতা উপলব্ধ হইলে দেশের যে মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং হিন্দুজাতির সংখ্যা আর অধিক হ্রাস না পাইয়া আবার বৃদ্ধিলাভ করিবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিবার কারণ দেখা যায় না। তাহা হইলে ভারতের গৃহে গৃহে আবার সুখ সমৃদ্ধির বাসন্তী কৌমুদী হাস্য করিবে; ভারত হইতে এই দারুণ জীবনসংগ্রাম ও অতৃপ্তির লোমহর্ষণ আর্ত্তনাদ বিদায় লইবে,—দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করালমূর্ত্তি তখন ভারতে আর আবির্ভূত হইবে না। কমলার কৃপাকটাক্ষে ও বীণাপাণির বাঞ্ছিত বর লাভে ভারতবাসী মাত্রই সুখ শান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধাস্বাদ করিতে সক্ষম হইবে।

CHARITY AND PAUPERISM.

দানধর্ম্ম ও দারিদ্র্য।

পরিশ্রমলব্ধ ধনসামগ্রীর বা অর্থের বিনিময়ে অন্য সামগ্রী না পাইলে কেহ সহজে উহা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু দয়ার বা করুণার উদয় হইলে প্রাপ্ত ধনে নিয়োজিত পরিশ্রমের কথা মনে উদিত হয় না। পরোপকার-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মানুষ দান করিয়া থাকে। এই দান করিবার প্রবৃত্তি সকলের নাই বলিয়া দাতার যশঃ সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হয়; কিন্তু যাঁহারা স্বগৃহে বিপন্নের বা আতুরের সাহায্যে কুণ্ঠা বোধ করেন এবং যশোলাভ বা উপাধি-লালসায় যাঁহারা সময়ে সময়ে মুক্তহস্ত

হয়েন, তাঁহারা দান করিয়াও প্রকৃত দাতার পরোপকার জন্য দান বা আত্মবিস্মৃতি সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন না।

দানের সহিত পরোপকার-ধর্ম্ম এরূপভাবে বিজড়িত যে "যে কোন উপায়ে দান কর—কেবলই দান কর—দানের অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই" এই সকল মত সমর্থন করিয়া যে কোন প্রচারকই প্রচার করুন না কেন, তাঁহার শ্রোতারা একতানমনা হইবেন; কারণ সকলেরই মনে হইবে যে তিনি মানবজাতির যথার্থ কল্যাণ কল্পনা করিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন—তিনি কারুণ্যের কোমল রসে বিগলিত হইয়া জনহিতকর কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছেন—তিনি সমাজের দুঃখ যাতনা দূর করিতে কৃত-সঙ্কল্প। কিন্তু "এই প্রকার দান ভাল, এই প্রকার মন্দ" এ সম্বন্ধে যিনিই যাহা বলুন না কেন, মানব-মন উহা দানকাতরতার লক্ষণ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে। অকাট্য প্রমাণ দেখাইয়া তিনি তর্কে জয়ী হইলেও মনে হয় যে, দানে বাধা দিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প এবং সঙ্কীর্ণতার আবরণ করিতে তর্কপ্রপঞ্চের সাহায্য লইতেছেন। অনশনে প্রাণত্যাগ হইতে পারে, অনাহারে ক্লেশ পাইবে, একথা মনে ভাবিতেও কষ্ট হয় এবং সাধ্য থাকিতে উহার নিবারণ-কল্পে চেষ্টা না করিলে যেন পাপ করিতেছি মনে হয়। এই ভয়ে হিন্দুসমাজে "দিও কিঞ্চিৎ না কর বঞ্চিত" কথার প্রচলন হইয়াছে। যাহারা নিতান্ত দানকাতর, তাহা-দিগকেও হিন্দুসমাজে দান করিতে হয়; কারণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম্ম এবং তীর্থদর্শনে গিয়া দান না করিলে সুফল লাভ হয় না। মহা মহা তীর্থস্থান ব্যতীত প্রতি গ্রামেই হিন্দুর দেবতা আছেন এবং গ্রামবাসীমাত্রকেই সময়বিশেষে তথায় পূজা দিতে যাইতে হয়। দান করিবার ইচ্ছা থাকিলে তথায় দানের উপযুক্ত পাত্রেরও অভাব নাই এবং ধর্ম্মের সহিত দানের এমনই নিকট সম্বন্ধ যে, উপযুক্ত পাত্রে দান না করিলে পূজায় ফললাভ হয় না বলিয়া ধারণা বদ্ধমূল হয়। দানকল্পে কি অদ্ভুত সমাজ-

বিধি! ইংলণ্ডে কিন্তু এলিজাবেথের সময় হইতে আইনের সাহায্যে দরিদ্রকে দান করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার ফলে মহকুমা বা পরগণা বিশেষের বিত্তবানকে তথাকার দরিদ্রদিগের ভরণপোষণ-কল্পে আইনসঙ্গত দণ্ডের ভয়ে চাঁদা দিতে হইত। ঐ চাঁদার টাকায় এক এক পল্লীসমাজ তথাকার দরিদ্রভরণভার গ্রহণ করিতেন। ব্যক্তিগত কারুণ্যের বিকাশ হইবার আশায় দরিদ্র ব্যক্তিকে অপেক্ষা করিয়া অনশন ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না বলিয়াই এই সকল সামাজিক দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই নিমিত্তই আমাদের দেশে পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে অন্নসত্রের ব্যবস্থা ছিল। তথাকার প্রতিষ্ঠিত দেবতার নিকট সাধু সন্ন্যাসীর এবং শ্রমাসমর্থ আতুরদের অন্ন-সংস্থান হইত। দানের পাত্রাপাত্র বিচারভার অধিকারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। এই অধিকারী গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী দ্বারা গচ্ছিত সম্পত্তির তত্বাবধানার্থ নির্ব্বাচিত হইতেন। এখন সে দান নাই, সে নির্ব্বাচনে যত্নও নাই।

মানব-হৃদয়ে পরোপকার-প্রবৃত্তি যত দিন জাগরূক থাকিবে, ততদিন এক প্রকার দানে মানব কখনই সন্তুষ্ট থাকিবে না। সামাজিক দান করিয়াই কারুণিক ব্যক্তি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না; তাঁহার দানের যে কত প্রকার পাত্র, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই জাতীয় লোকের দয়ায় সামাজিক দান ব্যতীত ব্যক্তিগত দানেরও ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। কিন্তু ভিখারী বুদ্ধিতেও বলিহারি। তাহারা গুপ্তদান ও সামাজিক দান উভয় দানেরই পাত্র হয়। কূটনীতিও তাহাকে একপ্রকার দানপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না। ভিক্ষা যাহাদের ব্যবসায়, তাহারা ভিক্ষা-লাভের অভূতপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিতে শিক্ষা করে। পূর্ব্বে যে সকল কারণে সন্ন্যাসী ফকিরকে দান করা হইত, এখন সে কারণে তাহাদিগকে আর দান করা হয় না। পূর্ব্বে তাহারা আকাঙ্ক্ষা ও বিলাসবাসনা ত্যাগ করিয়া সমাজকে সৎশিক্ষা প্রদান করিত; পরন্তু তাহারা এখন-

কার বাক্‌পটু, চতুর, চটুল সন্ন্যাসী ফকিরের মত ভণ্ড ছিল কি না সন্দেহ। অন্নচিন্তায় ব্যাকুল হইলে তাহাদের ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্যাঘাত হইবে এবং তাহাদের অনুকরণে দেশে ধর্ম্মপ্রাণ চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ভাবিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে দানবিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, সে বিধির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যে সকল সন্ন্যাসী ফকিরকে কষ্টার্জ্জিত অর্থের একাংশ প্রদান করি, তাহাদের কয়জন ধর্ম্মচর্চ্চা করে? তাহাদের বাহ্য আড়ম্বর ও ভেক কত যে সরলচিত্তকে মোহিত করে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। যেদেশে 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' অর্থব্যয় সমাজানু-মোদিত নহে, সে দেশে দেবতার দোহাই দিয়া যে কত কপট ধার্ম্মিক ও সেবায়েত প্রতারণা-সাহায্যে অপরের পরিশ্রমলব্ধ ধন অনায়াসে ভোগ করিতেছে, তাহার কথাইবা কি বলিব? যে দেশে ভিখারীকে প্রত্যা-খ্যান করিতে হইলে কতবার বিনীত হইতে হয়, কতবার মনে আশঙ্কা হয় বুঝিবা শাপভ্রষ্ট হই—যে দেশে পাপমুক্ত হইতে অথবা নিজ কল্যাণ সাধন করিতে কিছু না দিয়া বঞ্চিত করিতে সদাই আশঙ্কার উদয় হয়, সে দেশের ভিখারী, প্রাতঃকালীন আহার সমাপনপূর্ব্বক দ্বিপ্রহরে যে, হিন্দুগৃহস্থের দ্বারে উপনীত হইয়া আপন ভিক্ষাঝুলি পূর্ণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু "জয় রাধে" বলিয়া কঙ্কণবলয়াভরণা বৈষ্ণব-কন্যা অথবা "ভিক্ষা দাও মা" বলিয়া নধরকায় যুবা যখন আমা-দের অনুকম্পার পাত্র হইয়া ভিক্ষাপাত্র পরিপূর্ণ করিতে থাকে, তখন সমাজে অলক্ষিত ভাবে যে অকল্যাণ সঞ্চারিত হয়, তাহা কি ভৃত্যাভাবে ব্যতিব্যস্ত গৃহস্থ অনুভব করিতে অক্ষম?

স্বীকার করি শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে শ্রম-বিনিময়ে তাহারা অল্পধন উপার্জ্জন করিবে; কিন্তু মজুরী অল্প হইলে অন্য নানাবিধ ব্যব-সায়ের অনুষ্ঠান হইয়া পুনরায় যে তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে একথা কে না বুঝিতে পারে? পূর্ব্বে এক টাকায় যে পরিমাণ সামগ্রী

পাওয়া যাইত, এখন তাহার এক চতুর্থাংশও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ; অথচ পরিশ্রম বিনিময়ে উপার্জ্জিত বেতনেরও পরিমাণ-বৃদ্ধি হইতেছে না। অতএব সেই বেতনে পূর্ব্বাপেক্ষা এক চতুর্থাংশ লোকের অন্ন সংস্থান হইবার কথা। যে দেশে ধনাগমের নব নব পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে না, সে দেশে বেতনের এই অল্প ক্রয়কারিণী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অপাত্রে দান করাও সঙ্গত নহে। অনেকে বলেন দেশের বিত্তবান ব্যক্তিরা যদি কেবল অপরিহার্য্য নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী ভোগেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিগের উদ্বৃত্ত অর্থে ভিক্ষা দান করিলে দেশের দারিদ্র্য-নাশ হইতে পারে; কিন্তু দেশীয় নির্ম্মাতা ও প্রস্তুতিকারকদিগকে ধর্ম্মসঙ্গত উপার্জ্জনে বঞ্চিত করিয়া অলস ব্যক্তির অন্ন সংস্থান করিলে পূর্ব্বোক্ত লোকদিগের মধ্যে কি দারিদ্র্য আহ্বান করা হয় না? ফলতঃ এই সকল উপায়ে দেশে দরিদ্র ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এই নিমিত্ত দানের পাত্র নির্দ্ধারণ করা কেবল যে সময় সাপেক্ষ, এরূপ নহে, সমাজের কল্যাণ সাধন চিন্তা হৃদয়ে স্থান পাইলে উহা সম্পূর্ণ বিচারসাধ্য।

যখন আমরা ভিখারীকে প্রত্যাখ্যান করিতে অলীক সামাজিক ভয়ে, অথবা পাপমুক্ত হইতে কিংবা নিজ কল্যাণ-সাধন করিতে ইতস্ততঃ করি, তখন অবশ্য সমাজের কল্যাণ আমাদের মনে সকল সময় স্থান পায় না। বাস্তবিক সামাজিক জীব হইয়া সমাজের কল্যাণ না দেখা কি স্বার্থপরতা নহে। যদি সামাজিক দানে সন্তুষ্ট না হইয়া ব্যক্তিগত দানের আবশ্যকতা অনুভূত হয়, তাহা হইলে সে দানের কথা প্রকাশ করায় লাভ কি? শ্রমসমর্থ ব্যক্তি তোমার নিকট আসিলে বিনা পরিশ্রমে তাহার অন্ন-সংস্থান হইবে, দুষ্ট ভিক্ষাব্যবসায়ীকে এ কথা কেন জানিতে দিবে? এ রাজসিক দানে নিজের ও সমাজের কল্যাণ সুদূরপরাহত। এই জন্যই সাত্ত্বিক দান সমাজের মঙ্গলময় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। দেশ,

কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করিবে, বাম হস্ত তাহা জানিতে না পারিলে, শ্রমসমর্থ অলস জগৎ উহা কিরূপে অবগত হইবে। ইহাতে যে কেবল নিজের রজোগুণ হ্রাস পাইবে এরূপ নহে, সমাজের কল্যাণ অলক্ষিত ভাবে সাধিত হইবে বলিয়া পরম কারুণিক পরমেশ্বর কেবল উহার বিষয় জানিবেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মহামতি ম্যালথাস্ এককালে মহাপুরুষকণ্ঠনিঃসৃত অকাট্য প্রমাণ-সূচক বাণী উচ্চারিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের দীন-বিধির (Poor-Law) বিভীষিকায় পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া যে দানবিধি প্রচলিত ছিল, তাহারই ফলে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায়, স্যার ম্যাথিউ হেল সেই দানসংগৃহীত বিপুল অর্থে ওয়ার্ক-হাউস্ অর্থাৎ আবেশন সকল প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সৌভাগ্যবশতঃ ১৭২৩ সালে আইন সাহায্যে তাঁহার পরামর্শ প্রকৃত কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

আমাদের দেশে সামাজিক দানের হিসাব নাই। ইংলণ্ডের পল্লী সমাজে যে সকল দানব্যবস্থা আছে, তাহার বাৎসরিক বিবরণী হইতে এই তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল যে, দানভাণ্ডার যতই পূর্ণ হইবে, দেশে ভিখারীর সংখ্যাও ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যে দেশে দানবিধি নাই, সে দেশে ভিখারীও অল্প। পরিশ্রম না করিয়া অপরের উপার্জ্জিত ধনের কিয়দংশের অধিকারী হইতে পারিলে পরিশ্রম করিয়া যে ধনলাভ করিতে হয় এ ধারণা চিরজীবনে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না। রোগ না থাকিলে লোকে হাসপাতাল যায় না, কিন্তু অন্নবস্ত্রাভাব না থাকিলেও লোকে দাতার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া অপরের নিকট বস্ত্র বা তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া উহা অন্যের নিকট বিক্রয় করে, কিংবা তদ্বিনিময়ে অন্য কোন সামগ্রীর সংগ্রহ করিয়া থাকে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বা ধনীর যেরূপ অভাবের সীমা হইতে পারে না,

সেইরূপ দরিদ্রও আপন অভাব অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষা করে। ফলতঃ দানের ভাণ্ডার বর্ত্তমান থাকিলে এবং দাতার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত হইলে ভিখারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কৃতকর্ম্মা শ্রমজীবী শ্রমাসমর্থ্য জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ ধনে উদর পূর্ণ করে। ইহার ফলে শ্রমজীবীর সংখ্যা হ্রাস হয়, উহাদের মজুরি বৃদ্ধি পায় এবং উৎপন্ন সামগ্রীতে দেশের অভাব পূর্ণ হয় না; অপিচ দারিদ্র্য-দুঃখ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

এই জন্যই পাশ্চাত্য দেশসমূহে ব্যক্তি নিচয়ের সমবায়ে যে দান-সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, উহাতে আবেশন (work-house) সংস্থাপিত হয়। কেবল শ্রমাসমর্থ ব্যক্তি যে তথায় আশ্রয় লাভ করে, এরূপ নহে কর্ম্মসংস্থানহীন অথবা অঙ্গহীনের মধ্যে যাহাদিগ দ্বারা শ্রমবিভাগে যে পরিমাণ কার্য্য পাওয়া যহেতে পারে, তাহাদিগকেও কর্ম্ম করাইয়া নিজোপার্জ্জন সুখ অনুভব করিতে দেওয়া হয়। পদহীন কলে সেলাই করে, হস্তহীন পাদদ্বয়ের সাহায্যে কল চালনা করে; অলস ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হইয়া কর্ম্মগৃহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হয় এবং স্বাধীন-ভাবে জীবিকা-অর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় প্রজাদিগের সম্বন্ধে ১৮৭৪ সালের ৯ আইনের মতে এরূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, প্রকাশ্যে ভিক্ষা চাহিলে অথবা অকারণ ঘুরিয়া বেড়াইলে তাহারা দণ্ডনীয় হয় এবং তাহাদিগকে কর্ম্ম-গৃহে লইয়া গিয়া কর্ম্ম করাইয়া অন্নদান করা হয়; যাহারা শ্রমাসমর্থ তাহাদিগকে অন্নসত্রে (alms-house) প্রেরণ করা হয়।

ভারতবর্ষে গোরক্ষিণী সভা ভিন্ন ইতর দরিদ্রগণের প্রতিপালন নিমিত্ত অন্য কোন সমাজ দেখিতে পাওয়া যায় না। গোধন-বৃদ্ধিতে যে, দেশের ধনাগম হয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? এবং উহার প্রতিপালনে বলিষ্ঠ-কায় হইতে করাষকারিণী বৃদ্ধারও যে অন্নসংস্থান হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

একটী মাড়োয়ারী সমাজ সৎ প্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া লক্ষ লক্ষ অর্থব্যয়ে ভদ্রলোকদের বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য গো-মহিষাদি পোষণ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের এই কার্য্য ছিন্ন মূলে জলসেচনের ন্যায় বলিতে হইবে; কারণ যে প্রকারের সদ্যপ্রসূত গাভীগুলি বৎস বৃদ্ধি করিয়া গো-খাদকের দেশেও রক্ষিত হয় এবং কোটী কোটী ধন উৎপাদন করিয়া তাহাদের রক্ষক ও সেবকদের অন্ন সংস্থান করিতে থাকে, কিছুকালের জন্য দুগ্ধ বন্ধ হইলেই সেই প্রকারের দুগ্ধবতী গাভীগুলি হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে কষাইয়ের হস্তে ধ্বংস ও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং যে গুলি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য সেগুলি মাড়োয়ারী সমাজের সাহায্যে রক্ষিত হইতেছে! ঐ সকল জীবের মৃত্যুর পর তাঁহারা তাহাদিগকে ফেলিয়া দিতেছেন; অস্থিসংগ্রহকারীরা তাহাদিগের কঙ্কালগুলি সংগ্রহ করিয়া দেশান্তরে প্রেরণ করিতেছে; তাহাতে এদেশের ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির একটী প্রধান উপায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যে কারণে বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে গোজাতির এত আদর, সেই মূল কারণের বিষয় লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া এখন কেবল ধর্ম্মের ঠাট বজায় রাখিতে অনেক গোরক্ষিণী-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বটে; কিন্তু দূরদর্শিতার অভাবে গাভীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে দেশে গাভীর মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে এবং নিম্নশ্রেণীর ভারতবাসী যে কেবল গাভী বিক্রয় করিয়া ঋণজাল হইতে মুক্ত হইতেছে এরূপ নহে, অপরের গাভী সেবা করিবার সুযোগও পাইতেছে না। গাভীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে তাহারা আর পূর্ব্বের মত দুগ্ধ খাইতে পাইতেছে না, কাজেই তাহারা শারীরিক ও মানসিক বলে বঞ্চিত হইয়া আপনারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং দুর্ব্বল ক্ষুদ্রকায় ও মেধাহীন সন্তান-সন্ততিতে বংশ বৃদ্ধি করিয়া দেশে দরিদ্রতা আহ্বান করিতেছে।

দলে দলে আগত যত অপাত্র ভিক্ষুককে দান করিয়া তাহাদের ব্যক্তি-গত দুষ্কর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের দরিদ্রতার কারণ অনুসন্ধান

করিয়া উহার প্রতীকার কল্পে নির্দ্ধারিত উপায়ে দান করা সমাজের সকলেরই বিবেচনার বিষয়। এক কলিকাতা সহরে মুষ্টিভিক্ষারূপে যে চাউল দান করা হয়, উহার সমষ্টির মূল্য বৎসরে যে কত লক্ষ টাকা, তাহা কে বলিতে পারে? ঐ অর্থে উহাদের মধ্যে যাহারা শ্রম-সমর্থ তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইয়া লইলে দেশের কি উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে না? এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে অলসকে কি কর্ম্মঠ করা যায় না? আগাছার ডাল না কাটিয়া, সমূলে উৎপাটিত করিলে দারিদ্র্যদুঃখ কতকটা প্রশমিত হইতে পারে। নচেৎ তাহারা যে "তিমিরে সেই তিমিরেই" থাকিবে। উহাতে পরের উপকার করা দূরে থাকুক, সমাজের অপকার সাধিত হইবে এবং পরিশ্রমলব্ধ ধনের বিনিময়ে আত্মপ্রসাদ ত পরের কথা, সমাজ-কল্যাণও সুদূরপরাহত হইবে।

দেশে কমলার বরপুত্র বিলাস-পর-তন্ত্র পরোপকার-প্রবৃত্তি-শূন্য মানবের অসদ্ভাব নাই। কত শত বাহিরে একপ্রকার মহাত্মার ভিতরে আর একপ্রকার; প্রবঞ্চকদের পক্ষে ইহাদের ধনভাণ্ডারদ্বার অবারিত। কিন্তু এই হতভাগ্যদিগকে উপাধি-লোভ ও সমাজখ্যাতি দেখাইয়া রাজ-পুরুষ ও দেশহিতৈষিগণ কত না শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া লয়েন। ইহাদিগের এই প্রকার দান কিন্তু সর্ব্বদাই মঙ্গলময়, কারণ দেশহিতৈষী বুদ্ধিমানের প্ররোচনায় উহা ব্যয়িত হইয়া থাকে। হাঁসপাতাল, বৃহৎ-পুষ্করিণী খনন, ব্যাবহারিক শিল্প-বিদ্যালয় ইত্যাদি জনহিতকর বৃহদনুষ্ঠানে অধিক অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তির দানে উহা সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব না হইলেও উহার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব, যেহেতু জগতে অধিক সম্পত্তিশালী ব্যক্তির সংখ্যা অতি বিরল এবং উহাদের মধ্যে দানশীলের সংখ্যা আরও বিরল। মহম্মদ মহশীন্ বা রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ-দান এবং এজ্রা বা শ্যামাচরণ লাহার হাঁসপাতালে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু ঐ জাতীয় দানের নিমিত্ত

অপেক্ষা করিতে হইলে জগতের কল্যাণ-সাধনে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। অতএব যিনি যে পরিমাণে দান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের দেয় অর্থের সমষ্টি সংগৃহীত হইলে অতি সত্বর জগতের নানাবিধ মঙ্গল সাধিত হয়।

ভারতবর্ষের মত দেশে যখন এক বৎসর ফসল নষ্ট হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত মূলধনের অভাবে দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত হইতে হয়, তখন শ্রামিকদের কর্ম্ম-সংস্থানের নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। অনেকে শ্রামিকের স্থানান্তর করা উচিত বলিয়া প্রচার করেন, অনেকে চাঁদা করিয়া তাহাদের জীবনধারণের সংস্থান করিতে বলেন, অনেকে কিন্তু তাহাদের দিয়া বাণিজ্যিক হিসাবে লাভপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া লইতে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

শ্রামিকদিগকে স্থানান্তরিত করিলে যে দেশে তাহাদিগকে পাঠান হয়, সেই দেশের শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও বেতন-হ্রাস হইতে থাকে। যদি পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের প্রয়োজন সেই স্থানে অনুভূত হইয়া থাকে এবং তাহাদের সাহায্যে নূতন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মূলধন বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহাদের আগমন প্রার্থনীয়। কিন্তু তাহারা যে দেশ হইতে আসিয়াছে, সেই দেশে যথাসময়ে লোকাভাব হইবে ও তথায় শ্রামিকদের বেতন অযথা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা অল্পসংখ্যক বলিয়া সে দেশে অধিক ধনোৎপত্তি হইবে না।

চাঁদা করিয়া শ্রামিকদের জীবনধারণের সংস্থান করা ও ভিক্ষা দেওয়া একই কথা। ভিক্ষা প্রদত্ত হইলে মূলধন অল্প হইবে বা বৃদ্ধি পাইবে না এবং মূলধন যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই দেশে নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। মূলধনের অভাবে কার্য্যানুষ্ঠান রহিত হইলে শ্রামিকের ভবিষ্যৎ আশামূলে কুঠারাঘাত করা হয়। এই নিমিত্ত ভিক্ষাভাবে না দিয়া চাঁদার অর্থে স্থানান্তরে যাওয়া পর্য্যন্ত বা বাণিজ্যিক হিসাবে লাভপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া লওয়া পর্য্যন্ত সাহায্য করা শ্রেয়।

বাণিজ্যিক হিসাবে লাভপ্রদ যে সকল কার্য্য অপরাপর সকলে করিতেছে, সেই কার্য্য করাইয়া লইলে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করা হয়। এই নিমিত্ত সভ্যসমাজে রাজা এই অর্থে রেল বা রাস্তা ইত্যাদি মালা-মালের পরিচালনের সুবিধাপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই কার্য্যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, অপর ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয় না এবং কর্ম্মসংস্থান হেতু শ্রামিকেরা সাহায্য (relief) পাইয়া থাকে।

এতাবৎ যে সকল দানের কথা বিবৃত করা হইল, আমাদের ভদ্র-গৃহের পুরুষ বা কন্যা ঐরূপ সাহায্য কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। ইংলণ্ডেও ঐজাতীয় লোকের দুঃখ-নিবারণের উপায় দেখা যায় না। স্কট্‌লণ্ডদেশে কিন্তু চরিত্রবান্ দরিদ্রকেও অর্থসাহায্যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে সুযোগ ও অবকাশ দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতে এরূপ কার্য্যকরী বিধি প্রবর্ত্তিত ছিল যে তাহার কল্যাণে ভদ্র ঘরের লোকে অন্নবস্ত্রের অভাব বড় একটা অনুভব করিতে পারেন নাই। একান্নবর্ত্তিতার কল্যাণে কেবল যে নিতান্ত আত্মীয় স্বজন একত্রে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সুখে দিনাতি-পাত করিতেন, এরূপ নহে, কত দূর কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীও অন্নজল বস্ত্র ও আশ্রয় পাইয়া আপনাদিগকে সংসারের অন্য লোকাপেক্ষা অভিন্ন ভাবিয়া ঐরূপে কালহরণ করিয়া গিয়াছেন। চরকায় সূতা কাটিয়া অনাথা বিধবা কখন গৃহপতির গলগ্রহরূপে অবস্থান করেন নাই।

স্বীকার করি কলে সূতা কাটার ব্যবস্থা হওয়ায় এখন আর চরকার সূতায় লাভ নাই। কিন্তু আমাদের দেশের ধনাগমের সহায়তা-কল্পে আত্মীয় অনাথ ও অনাথারা কি কোনরূপে উপযোগী নহেন? এখনকার গৃহপতির মূলধনের সাহায্যে সেলাইয়ের কলে অথবা মোজার কলে কেবল পেট-ভাতায় কি তাহারা বালিশের ওয়াড় বিছানার চাদর কিংবা মোজা তৈয়ারি করিয়া বাজার পরিপূর্ণ করিতে পারেন

না? পল্লীগ্রামে তেঁতুল কাটিয়া তাল করিয়া কি পর্ব্বতাকার করিতে পারেন না? সস্তায় ঝুড়ি ঝুড়ি কাঁচা আম কাটিয়া অল্প শিক্ষা সাধ্য চাটনি করিয়া কি সমগ্র পৃথিবীর চাটনি সরবরাহের ভার গ্রহণ করিতে পারেন না? অথবা মসলা চূর্ণ করিয়া পরিমাণ মত সংমিশ্রণ পূর্ব্বক ইউরোপ ও আমেরিকার অভাব মত মসলা অল্পমূল্যে সরবরাহ করিতে পারেন না? তাহারা সকলই পারেন এবং তাহাদিগকে গলগ্রহও হইতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রমবিভাগ-প্রথায় ব্যক্তি বিশেষের কার্য্য-সামর্থ্য নিয়োজিত করিতে কেহই ইচ্ছুক নহেন।

আমাদের সমাজকর্ত্তারা ভূয়োদর্শন গুণে যে সকল সমীচীন রীতির প্রচলন বিষয়ে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, আজিকালি তাঁহাদের বংশধরগণ বিলাসপরতন্ত্র ও দৃষ্টিহীন হইয়া এবং পৃথক থাকিয়া, পরদুঃখ-কাতরতাকে স্বার্থোন্নতির পরিপন্থী বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা হয়, কলিকাতায় থাকিয়া পৃথক ভাবে আত্মোন্নতির পথ অনুসন্ধান করেন; কিন্তু তাঁহারা একবারও ভাবেন না যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র কন্যার ভার কে গ্রহণ করিবে। যাহা সমাজের উপর ন্যস্ত ছিল তাহা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ আহ্বান করা কখনই দূরদর্শিতার লক্ষণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে না।

কেহ কেহ কিছু দান করিয়া মনে করেন, সমাজের কল্যাণ সাধন করিলেন, অথবা আত্মীয় স্বজনের উপকার করিলেন; কিন্তু দান কার্য্যকর বা সার্থক না হইলে দেশের অর্থনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং দানকাতরতা তাহার অন্যতম ফল।—ভিক্ষুক হইতেই বা কাহার সাধ? যাহাকে সমাজ ভিক্ষুক হইতে দেয় নাই, আজ তাহাকে ভিক্ষুক সাজিতে বলা যে কেন যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

ধনভোগ।

CONSUMPTION OF WEALTH.

যে সকল সামগ্রী অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না এবং যাহা যে দেশে ভোগ করিতে না পাইলে লোকে অসুবিধা ভোগ করে, সেইগুলি সেই দেশে মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়। দ্রব্য মূল্যযুক্ত হইলেই বুঝিতে হইবে যে উহা এরূপ কোন গুণযুক্ত হইয়াছে যে, অধিকারী হইতে বিযুক্ত হইবার সময় তাহাকে উহা অপর ব্যক্তির শ্রমজাত দ্রব্য পাইবার বা অপরকে পরিশ্রম করাইয়া লইবার ক্ষমতা প্রদান করে। এইপ্রকার বিনিময়সাধ্য সামগ্রীকে ধনসামগ্রী কহে।

ধনসামগ্রী ব্যবহার না করিলে উহা ভোগ করা হয় না এবং ভোগ করিলেই উহার উপকারিতা হ্রাস পাইতে থাকে। ধনসামগ্রী ব্যবহার করিতে করিতে কোনটীর উপকারিতা একবার ব্যবহারে, কোনটীর বহুবার ব্যবহারে নষ্ট হয়। কাঠ পোড়াইলে উহার অঙ্গার ভিন্ন আর কিছুই থাকে না ; কাচের সামগ্রী ভাঙ্গিয়া গেলে উহার মেরামত করিয়া ব্যবহার করা চলে না। ছুরির মত দ্রব্য ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও কতক কাজে আইসে এবং পুস্তক পাঠ করিলে যত দিন না উহা নষ্ট হইয়া যায়, তত দিন অনেক ব্যক্তি পাঠ করিয়া উহা ভোগ করিতে পারে। কোন সামগ্রী অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া থাকিলে যখন উহা ব্যবহারোপযোগী করিয়া কাজে লাগাইতে পারা যায়, তখনই লোকে বলে "এতদিন পরে ভোগে আসিল।"

ভোগের নিমিত্তই দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয়, বা লোকে উহা খরিদ করিতে ব্যয় করিয়া থাকে। কিন্তু ভোগ করিবার নিমিত্ত এক একটী সামগ্রী যাহাতে প্রয়োজন মত অধিক দিন বা অধিক বার ব্যবহার করিতে পারা যায়, মিতব্যয়ী মাত্রেরই তাহা দ্রষ্টব্য। নিত্য ব্যবহার্য্য

সামগ্রীর মূল্য অপেক্ষা সৌখীন দ্রব্যের মূল্য অনেক অধিক তথাপি সময় বিশেষে সৌখীন দ্রব্যের অধিক প্রচলন দেখা যায়। এই সকল সৌখীন দ্রব্য অষ্ট প্রহর ব্যবহার করিলে সময় বিশেষে উহার অধিক ব্যবহার পাওয়া যায় না। সেই জন্য উহা অধিক বার ক্রয় করিতে হইলে ধন নাশ হয়। আবশ্যক দ্রব্যাদি পুনরায় ক্রয় না করিয়া প্রয়োজন মত উহা যত অধিক ব্যবহার করিতে পারা যায় ততই কম ধননাশ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, যাহদের অধিক ধন আছে, তাহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে তাহা ভোগ না করিলে, বা তাহাদের বিলাসিতা বর্দ্ধিত না হইলে উৎপাদক বা প্রস্তুতিকারকের ধনাগম হয় না। ব্যবসায়ীরাও সেই জন্য ধনী খরিদ্দারকে যত অধিক মাল বিক্রয় করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করে এবং ধনীরাও নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া সুখানুভব করেন। ধনীর ধন কিন্তু কখনও বসিয়া থাকে না। মাটীতে কলসী করিয়া মোহর পুঁতিয়া রাখিলেও মোহরের টান বাড়িয়া যায়; সেই জন্য উহার মূল্যও বৃদ্ধি পায়।

যাঁহারা দ্রব্যাদি ক্রয় না করিয়া টাকা বাড়িবে বলিয়া কোম্পানীর কাগজ খরিদ করেন, তাঁহাদেরও টাকাতে দেশে ধনাগম হয়। রাজা সেই টাকা ধার করিয়া রেল, খাল, রাস্তা প্রভৃতির বিস্তার বা বড় বড় কুঠী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, তাহাতে নানা স্থানের দ্রব্যাদি বিদেশে নীত হইয়া স্থানজনিত মূল্যযুক্ত হয়, অথবা এঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার কুলি ইত্যাদি বহু লোকের অন্ন-সংস্থান হইয়া থাকে। লোকে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিলেও ব্যাঙ্ক ঐ টাকায় মহাজনী করে এবং কার্য্যক্ষম ব্যক্তিরা উহা ধার করিয়া দেশের ধনোৎপাদন করে; অতএব উৎপাদিত ধন যেভাবেই ব্যবহার করা হউক না কেন, উহাতে কোন না কোন ব্যক্তির উপকার হইয়া থাকে।*

* গ্রন্থকারের "ধনবিজ্ঞান" নামক পুস্তকে "ব্যাঙ্কিং ও মহাজনী" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বাস্তবিক পক্ষে লোকে যখন কোন ধনসামগ্রী ব্যবহার করে, তখন বিশেষ কোন কারণ উপস্থিত না হইলে উহা কোন্ দেশে উৎপাদিত বা খরিদ করিলে কোন্ দেশের লোকের ধনাগম হইবে, একথা ভাবিয়া দেখে না। ধন অধিক ব্যবহার করিলে সন্তানসন্ততির থাকিবে না, এই কথাই অধিকাংশ লোকের মনে জাগরিত হয়। নিজে ব্যবহার করিয়া উদ্বৃত্ত ধন যে জাতি বংশধরগণের জন্য রাখিয়া দেয়, সে জাতির আর এক পুরুষে ধনের অভাব থাকে না। কিন্তু ঐ ধন শীঘ্র অপরিমিত ভাবে ভোগ করিয়া নষ্ট করিলে পুনরায় অভাব দেখা দেয়। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের মুখে শুনা যায়, "পেটে বাণিজ্য, পেটে দারিদ্র্য"। এই কথা অতীব সমীচীন। আহারীয় ও পানীয় সামগ্রী একবার মাত্র ভোগ করা যায়; অতএব অধিক মূল্যের ঐ জাতীয় সামগ্রী অপরিমিত ভোগ করিলে ধননাশ হয় এবং যে দেশে যে পরিমাণে ধনাগম হয়, তদপেক্ষা অধিক ভোগ করিতে হইলে স্বতঃই সেই দেশে দরিদ্রতা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ধন-ব্যবহারের উপর জাতির ধনবত্তা বা দরিদ্রতা নির্ভর করে। এই জন্যই পরিণামদর্শিতা ও বহু পরিশ্রমে ধন উপার্জ্জিত হইলে কিরূপে তাহা ভোগ বা ব্যবহার করিতে হয়, তাহাই ধনভোগে আলোচিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ধনবিশেষের ভোগে উহার ক্ষয় নির্ভর করে। আহারীয় সামগ্রী একবারমাত্র ভোগ করা যায়; অনেকবার ব্যবহার করা যায়, এমন সামগ্রীও আছে; আবার অন্য প্রকারের এরূপ সামগ্রীও আছে, যাহা ব্যবহারযোগ্য না হইলে বিনিময়সাধ্য হয় না; আবার এরূপ সামগ্রী আছে, যাহা ভোগ করিতে করিতে অব্যবহার্য্য হইলেও বিনিময়সাধ্য হইয়া থাকে।

আহারীর সামগ্রী বিনা মানুষের জীবনধারণ হয় না; কিন্তু অধিক মূল্যের আহারীয় সামগ্রীও একবার ভোগেই বিনষ্ট হইয়া যায়। পরন্তু

অধিক মূল্যের আহারীয় বস্তু অকারণ ভোগ করিলে যে পরিমাণে ধননাশ হয়, সেই অনুপাতে শরীরে বলাধান হয় না। আহার বিশেষের যে ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে, এ কথা অবশ্য সকলেরই স্বীকার্য্য ; কিন্তু অল্প মূল্যের আহার্য্য দ্রব্য হইতে যদি কতক পরিমাণে সে গুণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রয়োজন মত অধিক মূল্যের আহার্য্য দ্রব্যের ভোগে দোষ নাই। অকারণ সর্ব্বদাই অধিক মূল্যের খাদ্য দ্রব্য ভোগে ধননাশ হয়, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিবেন।

শুনা যায় সে কালের নবাবেরা বহুমূল্যের মুক্তা পুড়াইয়া চূণ করিয়া পানের সঙ্গে খাইতেন ; শামুক-পোড়া চূণ হইতে এ কার্য্য সম্যক্‌রূপে সুসিদ্ধ হইতে পারিত ; তাহাতে স্বাদের বোধ হয় কিছুই তারতম্য হইত না এবং উহার ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষেও মূল্যের অনুপাতে এমন কিছু দোষাবহও নহে। পেশীতে বল হইবে বলিয়া অধিক মূল্যের মাংস ভোজন করিলেও যে উপকার হয়, ঘৃতপক্ক ডাইল খাইলেও সেই উপকার দর্শে। এদেশের কুস্তীগীর পালোয়ান বা সিপাহীদের অপেক্ষা ইয়ুরোপীয় সৈনিকদের শারীর বল অধিক নহে। অতএব বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে কেবল অনুকরণের খাতিরে বলাধানের নিমিত্ত এদেশীয়দের মাংসভোজনে অকারণ ধননাশ হয়, কিন্তু ডাল খাইলে তাহা হয় না। এদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মস্তিষ্ক-চালনায় কোন দেশেরই পণ্ডিত অপেক্ষা হীন ছিলেন না। তাহার উপর তাঁহাদের শরীরে বলও যথেষ্ট ছিল, কারণ অনেক সময় রেলের অভাবে তাঁহারা বহুদূর পদব্রজে গিয়া বিদায় লইয়া আসিতেন। কিন্তু তাঁহাদের আহারীয় সামগ্রী কি ছিল ?—আতপ তণ্ডুল, হৈয়ঙ্গবীন, মটর ডাল সিদ্ধ, নিরামিষব্যঞ্জন, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন ইত্যাদি। এখনকার অধ্যয়নশীল ব্যক্তি যে মূল্যের খাদ্য সামগ্রী ভোগ করে, তদনুপাতে তাহাকে পূর্ব্বের সেই পণ্ডিতগণের অপেক্ষা অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন বা অধিক কায়িক পরিশ্রম করিতে দেখা যায় না।

পূর্ব্বে ভদ্র সমাজে একখানি বস্ত্র ও উত্তরীয় এবং অল্প মূল্যের চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিলেই সভ্যতা ও ভদ্রতা রক্ষা করা যাইত। কিন্তু ইয়ুরোপীয়গণের অনুকরণে আজ কাল কাপড় চোপড়ে অধিক খরচা পড়িতেছে। পোষাক পরিচ্ছদ ও জুতা ছিঁড়িয়া গেলে আর ভোগে আইসে না। অতএব অনাবশ্যক আহার্য্য দ্রব্যে ও পরিচ্ছদে যতই অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, ততই ধননাশ হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এদেশে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে ব্যাবহারিক শিল্প বিদ্যা-বিস্তার, কর্ম্মকর্ত্তা প্রভৃতির অভ্যুদয়, না হওয়াতে দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে না। অধিকন্তু অভাববৃদ্ধির সহিত অল্পোৎপাদিত ধনের অপরিমিত নাশ হওয়াতে দরিদ্রতার প্রাদুর্ভাব হইতেছে। কল কারখানার একটী স্ক্রু আল্গা হইলে যেরূপ হঠাৎ বিপদ হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ বহুদর্শিগণ দ্বারা গঠিত সমাজের বন্ধন নূতন সৃষ্ট অভাব মোচনার্থ নূতন নূতন বিলাস দ্রব্যের ভোগাভিলাষে শিথিল হওয়ায় দরিদ্রতা ও অনশন-বিপদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ইয়ুরোপীয় সভ্যতার অনুকরণে যে দিন কতকগুলি অপরিণামদর্শী ব্যক্তি বহুকালের সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া সামান্য মূল্যের বস্ত্রোত্তরীয় ও উপানহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহু-মূল্যের আহার্য্য ও নানাবিধ পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই দিন আমাদের সমাজে যে কুগ্রহ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার বশে জীবন-সংগ্রাম অকারণ ঘোরতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। শরীর ও মস্তিষ্ক বল কিসে পরিপুষ্টি লাভ করে, এখন সেই প্রধান লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমরা তুচ্ছ বেশ-বিন্যাসাদি বাহ্য আড়ম্বরই ভদ্রতা ও সভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া তাহাতে মগ্ন হইতেছি।

ব্যবহারযোগী না হইলে যে সকল সামগ্রী বিনিময়সাধ্য হয় না, সেই সকল সামগ্রী অধিক পরিমাণে ভোগ করিলে অধিক ধননাশ হইয়া থাকে। একটী ভাল কাচের গেলাস ও এনামেলের গেলাসের মূল্য

প্রায় সমান, এবং একটী কাঁসার গেলাসের মূল্য উহার দ্বিগুণ হইবে। একটী এনামেলের গেলাসের চটা উঠিয়া অব্যবহার্য্য হইতে দুই চারিটী কাঁচের গেলাস ভাঙ্গিয়া যায়, এবং একটী কাঁসার গেলাস অব্যবহার্য্য হইতে দুই চারিটী এনামেলের গেলাস নষ্ট হয়। অধিকন্তু কাঁচের গেলাস ও এনামেলের গেলাস নষ্ট বা অব্যবহার্য্য হইলে তাহার কিছুই পাওয়া যায় না ; কিন্তু একটী কাঁসার গেলাস অব্যবহার্য্য হইলে তাহার অর্দ্ধেক মূল্যও পাওয়া যায়। অতএব কাঁচের সামগ্রীতে অনভ্যস্ত ভারতবাসী কাঁসা বা পিত্তলের সামগ্রী ক্রয় না করিয়া কাচের ও এনামেলের সামগ্রী ক্রয় করায় ভারতবর্ষের কাচের ও এনামেলের সামগ্রী খরিদ খাতে দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ ধননাশ হইতেছে।

এইরূপে ভারতে সিগারেট খাতে, দেশলাই খাতে ও বাজে খাতেও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ ধন নষ্ট হইতেছে। যাহাদের দেশে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে ধনোৎপাদনের উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে না, তাহাদের দেশে ধননাশের উপায় সমর্থন করিলে দরিদ্রতা আহ্বান করা হয়। শুনিতে পাওয়া যায় ইংলণ্ডে যে পরিমাণ ধন উৎপাদিত হয়, তাহার পাঁচ ছয় গুণ ধন সে দেশে পূর্ব্ব হইতেই মজুদ থাকে ; অর্থাৎ ইংলণ্ডে যে পরিমাণ ধন উৎপাদিত হয়, তাহার সমস্তই তদ্দেশবাসিগণ ভোগ করে না, নচেৎ মজুত থাকিবে কেন ?

দেশীয় ধনের বিনিময়ে অল্পমূল্যের অল্পকালস্থায়ী কোন দেশজাত সামগ্রী অপেক্ষা অধিক মূল্যের দীর্ঘকালস্থায়ী মজবুত বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিলে ধননাশ হয় না। এদেশীয় বর্ষমাত্রস্থায়ী এক টাকা মূল্যের হারিকেন লণ্ঠন অপেক্ষা বিলাতের ২॥০ টাকা দামের ২০ বৎসরস্থায়ী হারিকেন লণ্ঠন ব্যবহার করিলে গৃহস্থের ৮গুণ কম ধননাশ হয় অর্থাৎ যে পরিমাণ পরিশ্রমের বা পরিশ্রমজাত সামগ্রীর বিনিময়ে ১ টাকা পাওয়া যায়, তদ্বিনিময়ে বিলাতী মজবুত লণ্ঠন খরিদ না করিয়া দেশী কম

মজবুত লণ্ঠন খরিদ করিলে ৮গুণ ধননাশ হয় বা দেশের পরিশ্রম বা পরিশ্রমজাত সামগ্রীর মূল্য ৮ গুণ হ্রাস পায়; এবং গৃহস্থের আয় হইলে সমগ্র দেশের আয় হইতে দেখা যায়। কৃতকর্ম্মা লোকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বিদেশীয় হারিকেন লণ্ঠনের মত লণ্ঠনের জন্য ২৷৷০ টাকার কিছু অধিক দেওয়ায় দোষ হয় না; কিন্তু ২০ বৎসর পূর্ব্বে যে জাতীয় লণ্ঠন হইয়াছে, এবং যাহার আজ পর্য্যন্ত কোন উন্নতিই হইল না, বৎসর কালের জন্য উহা এক টাকাতেও খরিদ করিলে ধন নাশ হয় এবং অকৃতকর্ম্মার সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় ও দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দেওয়া হয়।* এদেশীয় ধনের বিনিময়ে অল্পকালস্থায়ী

* কোন নষ্টপ্রায় বা নূতন শিল্পজাত বা কৃষিজাত সামগ্রী যাহাতে অপর দেশের সেই জাতীয় সামগ্রীর সহিত অবাধে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এতদর্থে রাজ্য হইতে যে সাহায্য প্রদান করা হয়, তাহাকে বাউন্টী (bounty) কহে। বাণিজ্য রক্ষার্থে অধিক মূল্যে সামগ্রী ক্রয় করাও ঐ জাতীয় সাহায্যের অন্তর্গত। উপযুক্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করাই কর্ত্তব্য। জার্ম্মাণীর শর্করা, যখন সংক্ষিপ্ত ব্যয়ে প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর হইল, তখন ঐ রাজ্য হইতে বাউন্টি মঞ্জুর হইয়াছিল। যদি উন্নত উপায়ে ব্যয় সংক্ষেপে উহা প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর না হইত, তাহা হইলে বাউন্টী ও মঞ্জুর হইত না। যে সামগ্রী প্রস্তুতিতে নির্ম্মাতা কার্য্যকৌশল ও ব্যয় সংক্ষেপ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন না, তাহাকে সাহায্য করা দূষণীয়।

Patriotism demands that the greater cost and the slight discomfort of indeginous goods should be cheerfully put up with at the outset. But remember no such movement can be permanently successful unless it involves a determined effort to improve their quality, and cheapen their cost, so as to compete successfully with foreign products (H. H. Gaekwar's address. Indian Industrial Conference.)

In spite of the imposition of countervailing duties and extra tariffs the bounty-fed sugar from Europe beats the Indian refiner

ভিন্ন দেশীয় খেলনা বা জার্ম্মাণী বা ফ্রান্সের রঙচঙে সামগ্রী ভোগ করিলেও ধন নাশ হয়। সকলেই স্বীকার করেন, ধন না থাকিলে কিন্তু ঐ সকল অল্পকালস্থায়ী সামগ্রী খরিদ করা যায় না; কিন্তু ঐ অল্পকাল-স্থায়ী সামগ্রীর বিনিময়ে যে ধন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অধিক-কালস্থায়ী সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারিত। সেই সকল বহুকালস্থায়ী সামগ্রী কিছুকাল ব্যবহার করিয়া অবস্থামত বিক্রয় করিলে অন্য ধন সামগ্রী পাওয়া যায়; কিন্তু খেলনা বা অল্প মূল্যের রঙিণ জার্ম্মাণ শীতবস্ত্র বা ফরাশী রেশমী কাপড় সামান্য ব্যবহার করিলেও তদ্বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যায় না। ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক মূল্য দিয়া বহুকাল-স্থায়ী কাশ্মীরের বা এ দেশীয় কলের পশমি সামগ্রী খরিদ করিলে উৎপন্ন বা উপার্জ্জিত ধনের বিনিময়ে উপযুক্ত সামগ্রী পাওয়া যায়।

আহারীয় সামগ্রী একবার ভোগেই নষ্ট হয় বলিয়া উহা যে দেশে সস্তায় উৎপন্ন হয়, তথা হইতে আনিয়া ভোগ করিলে ধননাশ হয় না। এই জন্যই ইংলণ্ড নিজে গোধূম উৎপাদন না করিয়া অপর দেশের গোধূম গ্রহণ করে এবং স্বদেশে চিনি উৎপন্ন করিলে উহা দুর্মূল্য হইবে বলিয়া বিদেশী চিনি ভোগ করে। এই ইংলণ্ড কিছুকাল পূর্ব্বে স্বদেশে দেশলাই প্রস্তুত করিয়া অন্যদেশে সরবরাহ করিত; কিন্তু আপেক্ষিক ব্যয়ের তারতম্যানুসারে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া এখন আর যেমন অন্যদেশে সরবরাহ করিতে পারিতেছে না, সেইরূপ ভারতবর্ষ এখন

hollow on his own field. The reason is not far to seek; laws can cure only artificial anomalies; the levy of extra duties can countervail only the adventitious advantage of bounties and subsidies; but what can remedy causes of mischief that lie deeper, ingrained in the very constitution of Indian grower and inherent in the very conditions under which the Indian refiner has to work—Ibid.

অন্য দেশকে শর্করা না যোগাইয়া নিজেই জার্ম্মণীর চিনি ব্যবহার করিতেছে। অন্যান্য বস্তু অল্প পরিমাণে ভোগ করিলে ক্ষতি হয় না, কিন্তু আহারীয় দ্রব্য সামাগ্রী অল্প পরিমাণে ভোগ করিলে উদর যে পরিমাণে অল্প পূর্ণ হয়, সেই পরিমাণে বল কম হইয়া থাকে। এই জন্য দ্বিগুণ মহার্ঘ সামগ্রীর অর্দ্ধেক না খাইয়া সস্তা সামগ্রী অধিক খাওয়া ধনবিজ্ঞানসম্মত। আর একটী কথা, এদেশে ধান্যের পরিবর্ত্তে পাটের চাষ করিলে দেশের অপেক্ষাকৃত অধিক ধনাগম হয় অর্থাৎ সমপরিমাণ ভূমির উৎপন্ন ধান্য অপেক্ষা উৎপন্ন পাটের অধিক পরিমাণ সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতা হয়। এই অধিক ধনে, দেশীয় চাউল দুর্ম্মূল্য হইলে বঙ্গবাসী বিদেশ হইতে সুলভ মূল্যের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ চাউল আনাইয়া ব্যবহার করিতে পারে; তাহাতে দেশের ধন নাশ হয় না। তবে এই পাটের অধিক অর্থে আবশ্যক সামগ্রী ভোগ না করিয়া অল্পকাল-ভোগসাধ্য সামগ্রী ব্যবহার করিলে কৃষকের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না।

ভারতবর্ষে অল্পকালস্থায়ী সামগ্রীর ব্যবহার কখনই ছিল না। এদেশের তৈজসপত্র বহুকালস্থায়ী ও গৃহস্থের ধন বিশেষ। ইয়ুরোপের কাচের বাসন অতীব ভঙ্গুর। এদেশের কার্পেট বা কাঁশার পিতলের বাসন, বা কাশ্মীরের শাল বহুকালস্থায়ী ও দেখিতে সুন্দর বলিয়া ইয়ুরোপীয়গণ সখের জন্য স্বদেশে লইয়া যান। এই সখের সামগ্রী ইহাদের ধনসম্পত্তিরূপে গণ্য, কারণ বহুকাল ব্যবহারের পর বিক্রয় করিলে অনেক সময় তিন ভাগ টাকা উঠিয়া আইসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী পরম ব্যবহারোপযোগী ধন সামগ্রীর ভোগ করা ভারতবাসী সমীচীন বোধ করে না; সেই জন্য ঐ সকলের উৎপাদনে ভারতবাসীর এখন আর তত আসক্তি নাই। একেত তাহারা ধনোৎপাদনে পশ্চাৎপদ, তাহার উপর আবার ক্ষণকালস্থায়ী

দৃশ্যমনোহর সামগ্রী নিজেদের ধনের বিনিময়ে গ্রহণ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ধন উৎপাদিত হয়, ভোগান্তর তাহার সামান্য অংশও দেশে থাকে কিনা সন্দেহ;—যদি থাকে, তাহা হইলে এক বৎসর ফসল না হইলেই বা নষ্ট হইলেই দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে কেন? ইংরাজের ভোগবাসনা আমাদের অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহাদের ধনোৎপাদনের গৌরবে সমস্তই শোভা পায়। যাহাদের কৃষি ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, এবং যে দেশে কৃষিকার্য্যে জমিদার বা কর্ম্মকর্ত্তার আবির্ভাব নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহাদের চাষার মত ভোগ-বাসনা হওয়া উচিত। দরিদ্র লোক বড় লোকের অনুকরণ করিতে গিয়া অধঃপতনের পন্থা পরিষ্কার করে মাত্র। উৎপাদিত ধনের অনুপাতে ভোগের খরচ অল্প হইলেই দেশের অবস্থা উন্নত বলা যায়। ইংলণ্ডে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে যে পরিমাণ ধন উৎপাদিত হইতেছে, ভারতবর্ষে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে তাহার অনেক অল্প ধনের উৎপত্তি হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে ভারতবাসীর ভোগবাসনা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু ধনোৎপাদন-বাসনা বৃদ্ধি পাইতেছে না। তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছে। প্রত্যেক ভারতবাসীই অবশ্য একথা স্বীকার করিবে যে, কেবল দ্রব্যাদির পণ বাড়িতেছে, এমত নহে, বহুবিধ দ্রব্যের ভোগবাসনাও বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে যে কৃষক মৃত্তিকার মধ্যে মৃৎপাত্রে নিজের টাকা রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইত, আজি কালি পাট ও শস্য বিক্রয়ের পর একটী রঙচঙে টীনের ক্যাশ বাক্সে সে এখন টাকা রাখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিশ্চিন্ত হইতেছে। এরূপ অধিক নিশ্চিন্ত হইবার যে কোনই কারণ নাই, তাহা সে একবার নিজে ভাবিয়া দেখিতেছে না, অপরেও তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে না।

সকল বিষয়ে ভারতবাসী নানাবিধ দ্রব্য ভোগ করিয়া অধিক ব্যয় করিতে এক প্রকার কৃতসঙ্কল্প। লোকে কথায় বলে "রোজগার নাই, বাবুয়ানী আছে।" সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষে এই কথা প্রযুজ্য। চটের কলে ছুটীর সময় একবার যাইলেই দেখা যাইবে, শ্রামিকদের গায়ে রঙ্গিণ জামা, উড়াণী, পায়ে মোজা জুতা, মুখে সিগারেট। আহারীয় দ্রব্যের পণ বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার অর্থপরিমিত বেতন-বৃদ্ধিতে যথার্থ বেতন-বৃদ্ধি হয় নাই; অধিকন্তু জুতা জামা ইত্যাদির ভোগবিলাসে তাহাদের ধন-নাশ হইতেছে। সভ্য জগতে বাতি জ্বালিতে ও অন্যান্য বিষয়ে দেশলাই আবশ্যক হয়, কিন্তু দেশলাইয়ের অভাবে চাষীর বিশেষ ক্ষতি হয় না। দুই চারিটী দেশলাইয়ে তাহার সংবৎসরের আবশ্যক মত কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। চক্‌মকি ব্যবহার না করিয়া তাহাকে মাসিক দুই আনার হিসাবে এক মণ ধান্যের বিনিময়ে এক বৎসরের দেশলাই ক্রয় করিতে হয়! ইংলণ্ডের লোকপ্রতি বার্ষিক আয় বিয়াল্লিশ পাউণ্ড, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রায় দেড় পাউণ্ড বা পনর মণ ধান্য!

পূর্ব্বে মনুষ্যগণ সকল বিষয়েই অল্প অভাব অনুভব করিত। অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় আদিম মানবের আহারের অভাবই প্রধান অভাব ছিল; কিন্তু স্বভাবজাত ফল মূলে ও বন্য পশু দ্বারা সে অভাব অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়াছিল। তথাপি তাহার আর একটী অভাব রহিল; তাহা লজ্জানিবারণের নিমিত্ত বস্ত্র। যে দিন এই অভাব অনুভূত হইল, সেই দিন হইতেই মানবজাতি লজ্জা-নিবারণের উপায় উদ্ভাবনে যত্নশীল ও ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র হইতে রক্ষা পাইতে সচেষ্ট হইয়াছে। অনন্যমনে কর্ম্মফলা বুদ্ধির সাহায্যে শস্য উৎপাদন করিয়া যখন উদ্বৃত্ত শস্যের বিনিময়ে অপর লোকের পরিশ্রম-প্রাপ্তি সম্ভবপর হইল, সেই সময় হইতে গৃহকার্য্য ও অন্যান্য কার্য্যে সাহায্য পাইবে বলিয়া এবং স্বাভাবিক মানবপ্রবৃত্তির বশীভূত

হইয়া জায়াযুক্ত হইবার বাসনা মানব-হৃদয়ে সম্ভূত হইয়াছে। স্বামিসোহাগে অনুরাগিণী হইয়া স্ত্রী সংসারের যে কত অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নানা প্রকারে মৎস্য, মাংস তরিতরকারী প্রস্তুত করিয়া এবং পুরুষ দ্বারা সংগৃহীত তন্তুসার বৃক্ষের তন্তু বয়ন করিয়া স্ত্রীজাতি পুরুষের অবকাশ বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে। পুরুষও অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া অধিক ধনোৎপাদনে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু ধনোৎপাদনের সহিত ভাগিদারের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জায়াপতির যত অধিক সন্তানসন্ততি হয়, উৎপন্নধন ভোগ দ্বারা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। এক দিকে ধন যেমন ভোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অপর দিকে ইহা ভোগ করিয়া সন্তানসন্ততিগণ বড় হইয়া পুনর্ব্বার ধনোৎপাদনে সমর্থ হয়। উৎপাদিত ধনের অনুপাতে যদি অধিক সন্তানসন্ততি জন্মে, তাহা হইলে অল্প ধনেই উহাদের সকলকেই প্রতিপালিত হইতে হয় এবং কখন কখন আহারের বা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে দুর্ব্বল স্বাস্থ্যহীন মানবের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। মানবজাতির মায়া মমতা পশুর তুলনায় অতুলনীয়। পশুরা খাদ্য লইয়া মাতা পুত্রে বিবাদ করে, কিন্তু মানবের হৃদয় ভিন্ন উপাদানে গঠিত। একটী ফল পাইলেই মাতা পিতা ও পুত্র সকলেই তাহার রসাস্বাদ করে। হিন্দু সংসারের এই মায়া-বন্ধন অপেক্ষাকৃত দৃঢ় বলিয়াই একান্নবর্ত্তিত্ব এত দৃঢ়। এই জন্যই সন্তানসন্ততির বৃদ্ধির অনুপাতে অল্প ধনোৎপত্তি হইলেও সকলে অল্প ধন ভোগ করে, তথাপি কেহ কাহাকেও ত্যাগ করে না।

মহামতি ডারউইন বলিয়াছেন, কি মানব, কি ইতর প্রাণী—সকলের মধ্যে হস্তীর সন্তানসন্ততি সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। ত্রিশ বৎসর বয়সের পর হস্তিনীর বৎস হইতে আরম্ভ হয়, এবং নব্বই বৎসর বাঁচিলেও মোটের উপর ছয়টীর অধিক সন্তান হয় না। তিনি বলেন,

৭৪০ কি ৭৫০ বৎসর পরে প্রথম হস্তিনী হইতে প্রায় ১৯০ লক্ষ হস্তী উৎপন্ন হইয়া জীবিত থাকিতে দেখা যায়। মানবজাতির বংশবৃদ্ধির পরিমাণ সকল দেশে ও সকল সমাজে একরূপ নহে; তথাপি অনেক সমৃদ্ধ দেশে ২৫।৩০ বৎসরেই উহা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়।

মানবের এই বংশবৃদ্ধির অনুপাতে দেশের ধনোৎপত্তি না হইলে এক বৎসরের শস্যনাশেই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। একবার দুর্ভিক্ষ-কষ্ট অনুভব করিয়া জীবিত থাকিলে সংসারের মায়াবন্ধন স্খলিত হইয়া যায়; দেহ দুর্ব্বল ও পীড়াপ্রবণ হয়, এবং সন্তানসন্ততি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই জাতীয় লোকের দেশে মরক হইলে ইহারাই সর্ব্বাগ্রে কালগ্রাসে পতিত হয়।

লোকবৃদ্ধির অনুপাতে ধনোৎপত্তি অধিক হইলে নানাপ্রকার সামগ্রী-ভোগের অভিলাষ দেখা যায়। বর্দ্ধমান ভোগতৃষ্ণা ও বিলাস-বাসনার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত দেশ বিশেষে কখন সমাজ, কখন ধর্ম্ম ও কখন নীতি-অনুমোদিত কার্য্যাদির অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছে। রোমানেরা তাহাদের উন্নত অবস্থায় প্রাসাদ ও অট্টালিকা প্রভৃতির অঙ্গসৌষ্ঠবের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ করিত। গ্রীকেরা প্রস্তর খোদিত করিয়া মূর্ত্তিগঠনের উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল। ইংলণ্ড বাণিজ্যবিস্তার, নৌবল ও পোষাক পরিচ্ছদে বিপুল অর্থ ব্যয় করি-তেছে। ফরাসীরা নানাবিধ মুখরোচক খাদ্য, পোষাক ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভোগবিলাসে বিস্তর টাকা খরচ করিতেছে। মুসলমানেরা উন্নত অবস্থায় ভাল ভাল গৃহ, মস্‌জিদ, বিবিধ আহার্য্য দ্রব্য ও গন্ধ দ্রব্য এবং বহুমূল্য রত্নাদি ভোগ করিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে দেবতার পূজায় ও ধর্ম্মের নিমিত্ত মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠায় ও অতিথি সৎকার প্রভৃতি কার্য্যে এক সময়ে বহুল অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। এই দেশে দেবপূজায়, দান ধ্যান ও অন্নদান কার্য্যে যত অধিক অর্থ ব্যয় হইয়াছে, বিলাস ব্যাপারে

তাহার সামান্যাংশও ব্যয়িত হইত, কিনা সন্দেহ। এই জন্য শেষোক্ত ব্যাপারে অধিক খরচ পত্র হইলে এখনও লোক বলে "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়।"

দেশ কাল ও পাত্র বিশেষে ভোগের নাম বিলাসিতা বা সমাজানুমোদিত উচিতব্যয় রূপে পরিগৃহীত হয়। মানবের অভ্যাস, বৃত্তি, পরিশ্রমের তারতম্য ও দেশের জলবায়ুর উপযোগী ভোগের দ্রব্যকে নিত্য আবশ্যক দ্রব্য কহে। ইংলণ্ডের ধনবিজ্ঞানবিৎ সীনিয়র এই বিষয় সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত উদাহরণ স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন, জুতা ইংলণ্ডে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী; কিন্তু স্কটলণ্ড দেশবাসী দরিদ্রের পক্ষে ইহা বিলাস দ্রব্য। তথাকার মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে উহা সামাজিক ভদ্রতা রক্ষার উপযোগী সামগ্রী। এই অবস্থায় তাহারা পা বাঁচাইবার নিমিত্ত যত না হউক, সমাজে ভদ্রতা বজায় রাখিবার নিমিত্ত উহা পরিধান করে। ভারতবর্ষে ভদ্র সন্তান অবস্থাহীন হইলেও তাহার জুতা পরা বিলাসিতা নহে, কিন্তু নীচ ঘরের লোক ২০।২৫৲ টাকা বেতন পাইয়াও জুতা পরিলে উহা বিলাসিতা নামে অভিহিত হয়।

সীনিয়র সাহেব আরও বলেন, তুরস্কদেশে ধূমপান বিলাস নহে, মদ্যপান বিলাস; কিন্তু ইয়ুরোপে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রথা দেখা যায়। ইয়ুরোপে অভ্যাগতকে মদ্য প্রদান করা হয়। ভারতবর্ষে ধূমপান এবং তাম্বুল ও আতর প্রদান করা বিলাস নহে। চীনদেশে ও ইয়ুরোপে চা-পান করা বিলাস নহে, কিন্তু ভারতবর্ষে উহা বিলাস। ভারতবর্ষে চল্লিশ বৎসরের পর অহিফেন সেবন বিলাস বলিয়া গণ্য নহে। চীনদেশে সকল বয়সেই অহিফেন সেবন করিতে পারে। ইয়ুরোপে সকল শ্রেণীর লোকের জামা পরা বিলাস নহে; গ্রীষ্ম প্রধান ভারতে ছোট ঘরে তাহা বিলাস। এদেশে ভদ্র মহিলার, ও অল্প পশারবিশিষ্ট ডাক্তার বা দালালের ও বেহার অঞ্চলে উকিলের গাড়ী

পাল্কি চড়া বিলাস নহে। কিন্তু ঐরূপ আয়ের কেরাণীর পক্ষে তাহা বিলাস। এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, অবস্থাভেদে বিলাস দ্রব্যেরও তারতম্য আছে। যে সকল বিলাস সামগ্রী দুই একবার ভোগেই নষ্ট হয়, তৎসমুদয় অপেক্ষা বহুকালস্থায়ী বিলাস দ্রব্যের ভোগ অনেক ভাল, কারণ ব্যবহারের পরও বিক্রয় করিয়া এই সকল দ্রব্য হইতে কিছু পাওয়া যায়।

ধনবিজ্ঞানবিদেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যের অভাব দূর করিতে হইলে লোককে অধিক ধনোৎপাদন করিতে হইবে, নতুবা ক্রমান্বয়ে মূলধন ও পরিশ্রম নিয়োগ করিতে করিতে যখন সেই অনু-পাতে ধনবৃদ্ধি করা অসম্ভব হইবে, তখন লোকবৃদ্ধি যাহাতে না হয়, তাহাই করিবে। বাস্তবিক, ভদ্র ঘরের লোক যখন সাজ পোষাক বাহিরের ভদ্রতা বজায় রাখিতে পারেন না, তখন বিবাহ করিলে পাছে স্ত্রী ও সন্তানগণের দুর্দ্দশা দেখিতে হয়, এই ভয়ে দার পরিগ্রহও করিতে ইচ্ছা করেন না। এই ভদ্রতা বজায় রাখিতে না পারিলে লোকের মনে যে কত তীব্র যাতনার উদয় হয়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে *। ভোগবাসনার পরিতৃপ্তি করিতে না পারিলে হৃদয়ে দারুণ দাবদাহ হইতে থাকে বলিয়া হিন্দুধর্ম্মে তৃষ্ণাই দুঃখের উৎপত্তির কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই তৃষ্ণার (তন্হার) দূরীকরণ নিমিত্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মে আটটী ও ভারতের অন্যান্য ধর্ম্মে নানাবিধ পন্থার উল্লেখ দেখা যায়।

* সেই জন্য কবি বলিয়াছেন ;—

বরং বনং ব্যাঘ্রগজাদিসেবিতং

জলেন হীনং বহুকণ্টকাকীর্ণম্।

তৃণানি শয্যা পরিধানবল্কলং

ন বন্ধু মধ্যে ধনহীনজীবিতম্ ॥

অধুনা অভাব দূর করিবার নিমিত্ত অনেক জাতি লোকবৃদ্ধির পক্ষপাতী নহেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ফরাশী দেশ অর্থশূন্য হয়; সেই সময় ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের দুর্দ্দশার আর সীমা ছিল না। একে দেশের সর্ব্বত্র দারিদ্র্য, তাহার উপর যদি লোকবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে সেই দরিদ্রতা গভীরতর হইবে; তাই ফরাশীরা লোকবৃদ্ধি নিরুদ্ধ করিতে মনস্থ করিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির যাহাতে দুই তিনটীর অধিক সন্তান না জন্মে, তন্নিমিত্ত সকলকে উদ্যোগী হইতে কহিল। দুই তিনটীর অধিক সন্তান হইলেই উৎপাদিত ধনের ভাগিদার অনেক হইবে এবং কাহারও ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত না হইয়া সকলেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। ফরাশী মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিল,—বুঝিয়া তাহা অবলম্বন করিতে উদ্যত হইল। সেই দিন হইতে ফরাশীদের অভাব ও দারিদ্র্য দূর হইয়াছে এবং তাঁহারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করিতেছে।

ভারতবর্ষে বিবাহ-প্রথা কখনই রহিত হয় নাই,—হইবেও না। পিতৃঋণের শোধ ও পিণ্ডদানের নিমিত্ত পুত্রের আবশ্যকতা হিন্দুমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড-প্রয়োজনং" একটী প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবচন। যৎকালে এই বচন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন সুবিশাল ভারতভূমি ধনধান্যে পরিপূর্ণা, অথচ লোকসংখ্যা কম ছিল, এবং জীবন-সংগ্রামের কোন প্রাখর্য্যই ছিল না; ভারতের সেই অবস্থায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি একটী শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু আজিকার এই অতিরিক্ত লোক সংখ্যার অনুপাতে অল্প ধনোৎপাদন ও তজ্জন্য দুঃখদারিদ্র্যের বিভীষিকা দর্শন করিলে তাঁহারা বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত বিধান-খণ্ডনের ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন। এই নিয়মের বশীভূত হইয়া যাহার কেবল কন্যা সন্তান হইয়াছে, অথবা যাহার স্ত্রী বন্ধ্যা, তাহাকেও বংশরক্ষার নিমিত্ত অপর দার-

পরিগ্রহ করিতে হয়। যদি চরিত্র-রক্ষার নিমিত্তই শাস্ত্রকারগণ ভার্য্যাগ্রহণের বিধান করিতেন, তাহা হইলে বন্ধ্যা স্ত্রী থাকিতে কেহ অপর দার পরিগ্রহ করিত না।

ভারতবর্ষে হিন্দুর পৈত্রিক সম্পত্তিতে সকল পুত্রের অংশ বর্ত্তে। বঙ্গদেশে যদিও পিতা ইচ্ছা করিলে পুত্রকে না দিয়া অপরকে সম্পত্তি দিতে পারেন, তথাপি পুত্রকে বঞ্চিত হইতে সচরাচর দেখা যায় না। এই নিয়মে সকল পুত্রই অংশীদার হয় বলিয়া পৈত্রিক গৃহ বা জমি সমস্তই ক্রমশঃ লোকপ্রতি অল্প অল্প পরিমাণে বণ্টিত হয় এবং ঐ সকল লোক তখন আর পূর্ব্বের মত দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করিতে পারে না।

পণ্ডিত ম্যাল্‌থাস্ লোকজনের সুখস্বচ্ছন্দতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত দেশ বিশেষের আহারীয় দ্রব্যের পরিমাণের সহিত তত্রত্য লোকসংখ্যার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া যে মতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, অধুনা তাহাই অনেক দেশে অনুমোদিত হইতেছে। ভোগবাসনা-নিবৃত্তির কথা কিন্তু অন্য দেশে বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। যাহার যে অবস্থায়, যে দেশে, যে সময়ে, যে দ্রব্য ভোগ করা বিলাসিতা বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার সেই দ্রব্যে ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইলেই দেশের অনেক অর্থের সদ্ব্যবহার হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিলাস সামগ্রীর ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইলেও তাহা কোন না কোন উপায়ে অপরের উপকারে ব্যয়িত হইতে পারে। ধনী ব্যক্তিদের বিলাস-বাসনা প্রায় একজাতীয়। তাহাদের ভোগবাসনার পরিতৃপ্তির জন্য কয়েকটী মাত্র ব্যক্তির উপকার হয়। কিন্তু তাহাদের ধনের সাহায্যে বিবিধপ্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া বহু উপায়ে নানা জাতীয় লোকের উপকার করা যাইতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তির বিলাস-বাসনার নিবৃত্তি হইলে তাহার দেহ ও চিত্তের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ফলতঃ প্রাণপণে ধনোৎপাদন করিয়া যদি বিলাসভোগবাসনার নিবৃত্তি ও মৃত্যুর

অনুপাতে অধিক লোক-বৃদ্ধি না হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশে সুখস্বচ্ছন্দতা বিরাজ করে।

পরিশ্রমে ধনাগম।

এ জগতে কি বাস্তব কি অবাস্তব যে কোন ধনের অধিকারীকেই পরিশ্রমের সাহায্য লইতে হইয়াছে। আমরা চারিদিকে যে সকল উৎপন্ন ও প্রস্তুত সামগ্রীসমষ্টি দেখিতে পাই, তৎসমস্তই পরিশ্রম ও কর্ম্মফলা বুদ্ধিপরম্পরার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে; এবং সেই অবাস্তব অমূল্য ধন, যাহা চোরে লইতে পারে না এবং যাহার অধিকারী হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলী জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া মানব-জাতিকে অমিয় সুখের সুধাস্বাদ লাভ করিতে উন্নতিপথ উন্মুক্ত করিতেছেন, তাহাও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। দস্যু তস্কর ব্যতীত কেবল আলস্যে দিনাতিপাত করিয়া কেহই বাস্তব ধন সামগ্রী ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই এবং পরিশ্রম না করিয়া কেবল প্রতিভা-গুণেই কেহ অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। অনেকে হয়ত বলিবেন যে ধনবানের পুত্র বিনা পরিশ্রমে নানাবিধ ধনসামগ্রী ভোগ করে, কিন্তু সে ব্যক্তি যে সকল সামগ্রী ভোগ করিয়া থাকে, তাহা কখনই বিনা পরিশ্রমে আদৌ লাভ করা হয় নাই। অবাস্তব অমূল্য ধনের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। পণ্ডিতের পুত্র হইলেও বিনা পরিশ্রমে পিতার বিদ্যা-ধনের অধিকারী হইতে পারে না। অতএব বাস্তব ও অবাস্তব সামগ্রীর অধিকারী হইতে হইলে পরিশ্রম দ্বারা যে কিরূপ সহায়তা পাওয়া যায়, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশের কেন, বোধ হয় সকল দেশের যুবকদের এইটী বিশিষ্ট ধারণা যে প্রতিভা ও পরিশ্রম বিপরীত-ভাবাপন্ন এবং গর্দ্দভের

মত পরিশ্রম করা অপেক্ষা মূর্খ হইয়া থাকা অনেকাংশে শ্রেয়ঃ। দূরূহ কথার অর্থ, অথবা কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়া, বালকদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান ও শিক্ষকদের অভিবাদন লাভ করণান্তর, কত হতভাগ্য যুবকের মস্তিষ্ক যে বিকৃত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে নিতান্তই দুঃখিত হইতে হয়। প্রতিভাবান বলিয়া একবার প্রথিত যশঃ হইলে, লব্ধ মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিতে তাহারা স্বতঃই চিন্তাগ্রস্ত হয়, এবং ইহার ফলে নূতন কিছু শিক্ষা না করিয়া, মৌলিক চিন্তা ত্যাগ করিয়া, পুরাতন ভুলিয়া গিয়া এবং স্বকীয় প্রত্যুৎপন্ন মেধার সাহায্যে সমস্তই বুঝিতে পারিবার ক্ষমতা ভাণ করিতে গিয়া, আপনাকে নিতান্ত অপদার্থ রূপে পরিণত করিয়া থাকে।

এই যে জাজ্জ্বল্যমান শ্রেষ্ঠ কবি বা রাজ-নীতিজ্ঞ কিংবা বক্তা বা ইতিহাস-লেখকদের কথা আমরা শুনিতে পাই, ইহাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম না করিয়াই কি এত বড় হইয়াছেন? ইহাঁদের মধ্যে যাহাদের পাঠাভ্যাস ও লিখিবার অভ্যাস সম্বন্ধে আমরা ভাগ্যক্রমে সম্যক্ অবগত আছি, তাহাদের বিষয় আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রতিভা কখনই আলস্যের নিত্য সহচর হইতে পারে না। অভিধান-রচয়িতা বা সূচীপত্র-লেখকদের মত পূর্ব্বোক্ত সুধিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অত্যধিক পরিশ্রম করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা অন্য লোক অপেক্ষা এত অধিক উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন।

কি শীত কি গ্রীষ্ম প্রত্যহ প্রভাতে গিবন তাঁহার পাঠাগারে থাকিতেন। বার্ক মনুষ্য মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন এবং আমাদের ঈশ্বরচন্দ্রও তদ্রূপ ছিলেন। লাইবনীজ তাঁহার পুস্তকাগারের বাহির হইতেন না। প্যাস্কাল পড়িয়া পড়িয়াই মারা গেলেন। সিসিরো কোনরূপে ঐ কারণে মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। মিণ্টন ব্যবসাদারদের মত ঘড়ি ধরা নিয়মে পুস্তক পড়িতেন এবং তাঁহার সময়ের সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বেকনও তদ্রূপ

করিয়াছিলেন এবং র‍্যাফেল যদিও সাঁইত্রিশ বৎসরমাত্র জীবিত ছিলেন তথাপি তিনি সূক্ষ্ম কলাবিদ্যার এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে এখনও পরবর্ত্তী চিত্রকরদের মানস-পটে তিনি আদর্শরূপে পরিস্ফুট আছেন।

প্রতিকূল দৃষ্টান্তও ক্বচিৎ দৃষ্ট হয় বটে, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে বিশিষ্ট গুণবানের জীবনে পরিশ্রমই নিত্য সহচর। স্বীকার করি তাহাদের অনেকেই প্রথমাবস্থায় দারিদ্র্যের উৎসবহীন তমোনিশায় অপরিজ্ঞাত, দলিত ও লাঞ্ছিতের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছেন—অপেক্ষাকৃত সামান্য অধিক বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষিত, ঘৃণিত ও অন্যায়রূপে বিবেচিত হইয়াছেন; কিন্তু তখন হইতেই তাঁহারা চিন্তাযুক্ত, যখন অপরে নিদ্রিত; তাঁহারা অধ্যয়নশীল, যখন অপরে সামান্য বিষয় বুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ। তখন হইতেই তাঁহারা বুঝিতেন যে জগতের নিকৃষ্ট সুখাধিকারী নিকৃষ্ট জীবগণের সহিত তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। পরে যখন সুদিন আসিয়াছিল, তখন সামান্য ঘটনার প্রথম সুযোগে তাঁহারা লৌকিক জীবনের আলোকজ্যোতিতে এরূপে পরিস্ফুট হইয়াছেন। ভস্মাবৃত অগ্নির মত সামান্য পবন-হিল্লোল উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহারা জাজ্বল্যমান হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য তখনই লোকে বলিয়াছে, এ ব্যক্তি অসাধারণ প্রতিভাবান—কি আশ্চর্য্য লোকে তখন বুঝিল না যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন হইবার কারণ তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন ব্যতীত আর কিছুই নহে; তিনি কেবল স্বকীয় মস্তিষ্কের উপর নির্ভর না করিয়া, সহস্র মস্তিষ্কের ভাবসাগর মন্থন পূর্ব্বক আপনার অমূল্য ধন আপনি সংগ্রহ করিয়াছেন; তিনি অতীত ও বর্ত্তমান জ্ঞান সমষ্টির সারাংশ পরিজ্ঞাত হইয়া নূতন জ্ঞানের উন্মেষণায় প্রবৃত্ত। এই ত গেল অবাস্তব ধনাধিকারীর পরিশ্রমের কথা।

বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির সহিত আমরা স্বদেশজাত বা বিদেশ

হইতে আনীত যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় সখের দ্রব্য সামগ্রীর সমাবেশ দেখিতে পাই, তৎসমস্তই ভূগর্ভজাত এবং পরে মূলধন ও পরিশ্রমের সাহায্যে নানা প্রকারে প্রস্তুত ও রূপান্তরিত হইয়া অভাব মোচনের সামগ্রী বলিয়া মূল্যবানরূপে বিবেচিত হয়। অনেকের ধারণা যে আদিম জাতির অভাবও ছিল না এবং সেই নিমিত্ত মূলধন ও পরিশ্রমের আবশ্যকতাও ছিলনা। কিন্তু আমরা বলি তাহার প্রাত্যহিক আহারের নিশ্চিতত৷ ছিল না এবং সেইজন্য তাহাকে বনে বিচরণশীল প্রতিযোগী পশুর সহিত সংগ্রাম করিতেও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

ভূমি পরিশ্রম ও মূলধন বাস্তব ধনোৎপাদনে সহায়তা করে ; কিন্তু আদিম জাতির ভূমি ও মূলধন (স্বচ্ছন্দজাত ফলমূল, তীর ধনু ইত্যাদি) প্রকৃতি প্রদত্ত ছিল বলিয়াই কেবল পরিশ্রমের সাহায্যে আয়াসলব্ধ অপ্রচুর প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অধিকারী হইতে পারিয়াছে। অরণ্যে ফলমূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে করিতে পরিশ্রমের সাহায্যে জীব জন্তু ও নদীর মৎস্য ধরিবার উপায় করা হইয়াছে। ধৃত জীবগুলির সকল গুলিকে আহারের নিমিত্ত বধ না করিয়া এবং ফলমূল খাইয়া ইহাদের কতকগুলিকে প্রতিপালন করিয়া,মৎস্যগুলিকে শুষ্ক করিয়া, প্রতিপালিত পশুদের বৃদ্ধির সহিত ঘৃতদুগ্ধ নবনীত, ঊর্ণাজাত বস্ত্র, মাংস ইত্যাদির দ্বারা প্রাত্যহিক আহারের সংস্থান করিয়া, এবং পশুগুলির সাহায্যে ভূমি কর্ষণ করিয়া। আদি মানব আজি কালিকার সভ্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। ভবিষ্যত্যের নিত্য আহারের সংস্থান করিয়া ও পশুর সাহায্য পাইয়া বনবিহারী মনুষ্য নানাবিধ উপায়ে পরিশ্রমের সাহায্যে ধনোৎপাদন করিতে পারিয়াছে। অতএব এখনকার, ও পরবর্ত্তী বাস্তব ধনের অধিকারীকে অবশ্যই পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এখন কিন্তু ভূমির খাজনা হইয়াছে,

ও মূলধন সকলের নাই, তথাপি একবৎসর পরে খাজনা দিলে ও সুদ দিয়া মূলধন ধার করিলেও কেবল পরিশ্রমের সাহায্যেই কৃষকের ধনাগম হইয়া থাকে। অলসের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে।

প্রকৃতিজাত সামগ্রীর উপর নির্ভর করিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল মানবজাতির ক্ষুৎপিপাসা যখন দূরীভূত হয় না, তখন হইতেই প্রকৃতি-প্রদত্ত বস্তু হইতে কর্ম্মফলা বুদ্ধির ও পরিশ্রমের সাহায্যে দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন ও প্রস্তুত হইতে থাকে ; অর্থাৎ পরিশ্রমের সাহায্যে স্বভাবজাত সামগ্রীতে ধনাগম হইতে থাকে। ফলভরে অবনত বৃক্ষলতাদি পরি-শোভিত উর্ব্বর রত্নগর্ভ ক্ষেত্র মধ্যে বাস করিয়া কর্ম্মফলাবুদ্ধি ও পরি-শ্রমের অভাবে মানবজাতি আহারের জন্য লালায়িত হয়, এ বিষয় ভাবিলে প্রকৃতিদত্ত ভূমি ও বৃক্ষলতাদির স্বাবাবিক অবস্থাতেই যে ধনাগম হয় এ কথার অসারতা কে না উপলব্ধি করিতে পারে? কি বৃক্ষের ফল, কি অরণ্যের পশু, কি জলের মৎস্য, কি খনিজ ধাতুতে, যে পর্য্যন্ত না পরিশ্রমের সাহায্যে মানবজাতির অভাব মোচন করিতে সমর্থ হয়, সে পর্য্যন্ত কিছুই ধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অসভ্যজাতি হইতে সভ্যজাতির অভ্যুদয়ে পরিশ্রম সবিশেষ সহায়তা করিয়াছে। বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া গৃহনির্ম্মাণ করিতে, বল্কল পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিতে, এবং আহারীয় সামগ্রী যথানিয়মে প্রতিদিন পাইতে, প্রকৃতিদত্ত সামগ্রী অপেক্ষা কর্ম্ম-ফলাবুদ্ধি ও পরিশ্রম অধিকতর আবশ্যক। কারণ প্রকৃতির দান ত আছেই উহা কর্ম্মফলাবুদ্ধি ও পরিশ্রমের সাহায্যে ভোগে না আসিলে স্বস্থানে থাকা না থাকা সমান কথা।

যে সামগ্রী বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায়, যথা বায়ু বা নদীর জল, তাহার বিনিময়ে কেহই কিছু দিতে স্বীকার করে না। কিন্তু এই হাওয়া বা জল পাইতে পরিশ্রমের আবশ্যকতা থাকিলে উহারা মূল্যযুক্ত

হয় অর্থাৎ এরূপ কোন গুণযুক্ত হয় যে শ্রমনিয়োগকারী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেই তাহাকে গ্রহীতার পরিশ্রমলব্ধ সামগ্রী পাইবার অধিকার প্রদান করে। যখন স্বচ্ছন্দজাত সামগ্রীতে পরিশ্রম নিয়োগ করিলেই ধনাগম হয় তখন উৎপন্ন ও প্রস্তুত সামগ্রীতে পরিশ্রম নিয়োগ করিয়া রূপান্তরিত করিলে যে ধনাগম হইবে, তাহা আর বিচিত্র নহে।

বাণিজ্য।

বাণিজ্য বলিলে বণিকের বৃত্তি বুঝায়। বৈশ্যদের মধ্যে কেহ কৃষি, কেহ পশুপালন ও কেহ বাণিজ্য করিত। বাণিজ্য জাতিগত বিদ্যার অন্তর্গত ছিল বলিয়া পিতার নিকট পুত্রের শিক্ষালাভ হইত। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় বণিকের পুত্রই বণিকের কর্ম্মে অনেকাংশে সফল-কাম হয়েন। অতএব বাণিজ্য কার্য্য যে শিক্ষাসাপেক্ষ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের বঙ্গদেশের অনেকেরই ধারণা যে কেবল মূলধন থাকিলেই ব্যবসায় কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত হইতে পারে এবং শিক্ষার বিশেষ কোন আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা একবারও ভাবেন না যে বাজার-সম্ভ্রমই বণিকের মূলধনের দশগুণ অধিক কার্য্যকরী এবং-বাজার সম্ভ্রম লাভ করিতে ও ব্যবসায় বুদ্ধির বিস্তার সাধন করিতে বণিকের নিকট শিক্ষা নবিশী করা অথবা বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করা একান্তই আবশ্যক।

এখনকার মত রেল খাল রাস্তার বিস্তার না থাকিলেও পূর্ব্বেকার ও এখনকার বণিকের কার্য্যে মূলে বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

তিনি বিদেহে বা বৃদ্ধিতে নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া তাহাকে বৈদেহিক বলা হইত ; সার্থ বা বণিক সমূহকে তিনি বিদেশে পাঠাইতেন বলিয়া তাহাকে সার্থবাহ বলা হইত—দোকান করিয়া নগরে কার্য্য করা তাহারা সুবিধাপ্রদ ছিল বলিয়া তিনি নৈগম বলিয়া অভিহিত—পণ্যই তাহার জীবনোপায় ছিল বলিয়া তাঁহাকে পণ্যজীব বলা হইত, এবং ক্রয়বিক্রয়ে তিনি রত বলিয়া তাঁহার আর একটা নাম ক্রয়বিক্রয়িক।

এই সকল প্রতিশব্দ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে আধুনিক প্রধান প্রধান সামগ্রী প্রস্তুতকারী (manufacturer) অথবা উৎপন্নকারী—(Growers planters) দের মত বণিকগণ কোন দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন বা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন না। তাঁহারা এখনকার কারবারী, মহাজন বা আরিয়ৎদারদের মত অপরের নির্ম্মিত বা অপরের পরিশ্রম জাত বা উৎপন্ন পণ্য-দ্রব্য সকল ক্রয় করিয়া লাভের নিমিত্ত বিক্রয় করিতেন। এই নিমিত্ত নগরে কুঠি বা বাণিজ্যাগার নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ব্যবসায় পরিচালিত করিতেন। কেহ কেহ আবশ্যক হইলে একদেশে হইতে মূল্যবান ধাতু বা হীরা মুক্তা ইত্যাদি বহন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিয়া উহার ব্যবসায় করিতেন।

শস্য অজন্মা হইলে কৃষকের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু তাহার নিকট খরিদ করিয়া লাভে অপরকে বিক্রয় করিলে বণিকের ক্ষতি হয় না। বণিকগণ একদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা যে জাতিগত পণ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহাদের নিকট খরিদ করিয়া যাহার নিকট লাভ পায় তাহাকেই বিক্রয় করে। কোন প্রস্তুতকারীর ক্ষতি হইলেও বণিকের ক্ষতি হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে বৈশ্যদের অন্যান্য বৃত্তি সকল অপেক্ষা বণিকের বৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক। অতএব বাণিজ্যিক হিসাবে বলা যাইতে পারে "বাণিজ্যে বশতে লক্ষী-স্তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"। প্রথমে মনে হয় অভাব নিবারণ করাই বাণিজ্যের

মূল উদ্দেশ্য। বাস্তবিক পক্ষে এই স্বার্থপর জগতে স্বার্থ না থাকিলে বণিক কখনই এ কার্য্যে অগ্রসর হয় না এবং উৎপাদক ও প্রস্তুতি কারকও বণিকের সাহায্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয় না। ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনাতিরিক্ত সামগ্রীর সহিত অপরের প্রয়োজনাতিরিক্ত সামগ্রীর বিনিময় হইয়া থাকে।

প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে আপন আপন পণ্যের ক্রেতা অনুসন্ধান ও তাহার পর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ—এই দ্বিবিধ কার্য্যই করিতে হইলে—তাহার অবলম্বিত ব্যবসায়ের প্রভূত ক্ষতি হয়। সে অনন্যচিত্ত হইয়া স্বীয় ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করিতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করিতে গেলে বণিকবৃত্তির আবশ্যকতা অনুভূত হয়। বণিকদিগের দ্বারা বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূরীকৃত হয়। তাহারা ব্যবসায়ীদের নিকট পণ্য-দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া তদ্বিনিয়মে অর্থাৎ ব্যবসায়ীর নিজের ব্যবহারান্তে উদ্বৃত্ত দ্রব্য সামগ্রীর বিনিময়ে তাহা-দিগকে অপরের শ্রমজাত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ করে। অথবা অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক সামগ্রীর বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত আবশ্যক সামগ্রী সরবরাহ করে।

মূল্যবান্ সামগ্রী না থাকিলে তাহার বিনিময়ে মূল্যবান সামগ্রী প্রাপ্তি বা বাণিজ্য সম্ভবপর হয় না এবং বাণিজ্য ব্যতিরেকেও বিনিময় সম্ভবপর নহে। এইজন্য জগতে ধনবিজ্ঞান ও বাণিজ্যের বিষয় ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে স্বতঃই আলোচিত হইয়া থাকে।

দেশ বিশেষের ধনবৃদ্ধি না হইলে তদ্বিনিময়ে অধিক ধন পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের মত দেশ বাণিজ্য দ্বারা অধিক সমৃদ্ধ হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ দেশে কোন না কোন ধনসামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতেছে, নচেৎ কোন্ ধনসামগ্রীর বিনিময় করিয়া তাহারা অন্য ধন সামগ্রীতে দেশ পরিপূর্ণ করিতেছে?

নিজেদের ব্যবহারান্তে যে অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক বা অনুপকারী ধনসামগ্রী উদ্বৃত্ত থাকে তাহারই সহিত অন্যদেশের অপেক্ষাকৃত আবশ্যক বা উপযোগী ধনসামগ্রীর বিনিময় হইয়া বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই নিমিত্ত সভ্য জগতে বাণিজ্যের এত আদর। অনেকে অনুমান করেন যে বাণিজ্য ধনপ্রসূ নহে, যেহেতু বাণিজ্যে ধনের বিনিময়েই ধন পাওয়া যায় নূতন ধনের উৎপত্তি বাণিজ্যে সম্ভবপর নহে। এ কথা যথার্থ হইলেও যে ব্যক্তির বাৎসরিক ষাট মণ চাউলে তাহার সংসার প্রতিপালন হইতে পারে তাহার তদপেক্ষা অধিক চাউল থাকিলে উহা একেবারে নিস্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে অর্থাৎ একই সামগ্রী ব্যক্তি বিশেষের অভাব বা প্রয়োজন অনুসারে তাহার নিকট কতক মূল্যবান ও কতক মূল্যহীন বলিয়া অনুমিত হইবে এবং এই নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক বা অনুপকারী ধন সামগ্রীর বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত আবশ্যক বা উপকারী ধন প্রাপ্তি এক বাণিজ্যের সাহায্যেই সম্ভবপর হয়।

কেবল গোধূম কেবল ধান্য বা কেবল কয়লা বা কেবল লৌহ নির্ম্মিত সামগ্রী ভোগে লোকের ভোগ বাসনা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত লৌহনির্ম্মিত সামগ্রীর বিনিময়ে ইংলণ্ড ভারত সাম্রাজ্যের গোধূম পাইতে ইচ্ছা করে, এবং আমরা ব্যবহারান্তে যে অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত গোধূম থাকে তদ্বিনিময়ে ইংলণ্ডে প্রস্তুত যে সকল সামগ্রী আমরা প্রস্তুত করিতে পারি না উহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি এবং উহা প্রাপ্ত হইলে অপেক্ষাকৃত ধনী বলিয়া অনুমান করি। অতএব এই উদ্বৃত্ত ধন সামগ্রীর পরিমাণ যত অধিক হইবে তদ্বিনিময়ে অন্য ধন সামগ্রী প্রাপ্তির সম্ভাবনা বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু সেই উদ্বৃত্ত সামগ্রী যদি বিনিময়-সাধ্য না হয় অর্থাৎ জগতের কোন স্থানে উহা মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে উহা ধন

বলিয়া পরিগণিত হইবে না। বাণিজ্যরূপ কোষ্ঠি পাথরের দ্বারা দ্রব্য-সামগ্রী উৎপন্ন করা উচিত কি না ইহা স্থিরীকৃত হইলে অর্থাৎ জগতের বাণিজ্যে দ্রব্য গুলি মূল্যবান পণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে কি না ইহা একবার সিদ্ধান্ত হইলে ঐ সামগ্রী উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিলে দেশ পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া যায় এবং বাণিজ্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

ব্যবসার কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায় কখন এক ব্যক্তি নিজ নামে কারবার করিতেছেন, বা নিজেই লাভ লোকসানের দায়িক; কখনও বা কয়েক জনে মিলিত হইয়া কারবার পরিচালনা করিতেছেন; কখনও বা বহু সংখ্যক লোকে সম্ভূয়সমুত্থানে কারবার নির্ব্বাহ করিতে-ছেন। প্রথমোক্ত কারবারীকে একক ব্যবসায়ী বলে; দ্বিতীয়োক্ত ব্যবসায়িগণকে অংশীদার বা বখরাদার কহে এবং তাহাদের ব্যবসায়কে অংশীদারী ব্যবসায় বলা যায়। এবং তৃতীয়োক্ত ব্যক্তিগণকে কোম্পানীর অংশীদারগণ বলা যায়।

একাকী ব্যবসায় পরিচালিত করিতে সমর্থ হইলে কেহ অংশী হইয়া ব্যবসায় পরিচালন করিতে ইচ্ছা করে না। ব্যবসায়ের সবিশেষ সুবিধা হইবে মনে করিলেই লোকে অংশীদার গ্রহণ করিয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে কোন এক ব্যক্তির ব্যবসায় বুদ্ধি ও কার্য্য তৎপরতার দ্বারায় ব্যবসায়ের যেরূপ উন্নতি সাধিত হয়, হয়ত অব্যবসায়ী অংশীদারগণকে ব্যবসায়ের সুবিধা, অসুবিধার বিষয় বোধ-গম্য করাইয়া সেই ব্যবসায় তদ্রূপ উন্নতি সাধিত হয় না। ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনকল্পে কোন উপায় উদ্ভাবিত হইলে, কোন এক ব্যক্তি একক ব্যবসায়ী হইলে যেরূপ তৎপরতার সহিত ঐ উপায়দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তিনি অংশীদার হইলে অপর অংশীদারকে সেই উপায় বোধগম্য করাইয়া তদ্রূপ তৎপরতার সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ হইতে

পারেন না। কারণ ঐরূপ স্থলে হয় অংশীদারগণের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে, অথবা তাহাদের মতামত এত বিলম্বে প্রকাশিত হইতে পারে যে, তখন উদ্ভাবিত উপায় মত কার্য্য করিলে কৃতকার্য্য হইবার অল্পই সম্ভাবনা থাকে। খামখেয়ালী ব্যক্তির হঠকারিতায় আবার যেরূপ ব্যবসায়ের ক্ষতি হওয়া সম্ভব, উহার অংশীদারগণ থাকিলে হয়ত উহাতে সেরূপ ক্ষতি হইতে পারে না, কারণ তাহাদের সৎপরামর্শে ব্যবসায় বৃদ্ধি সুপথে পরিচালিত হইতে পারে।

বিশেষ গুণী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মিলিত হইলে অনেক সময় মূলধন ব্যতীত ব্যবসায় কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া লাভপ্রদ হয়। অনেকে হয়ত পাট দেখিলেই উহার ভাল মন্দ বিচার করিতে পারেন এবং বাজারে খাতির থাকায় সাত দিন পরে মূল্য দিব বলিয়া ধারে অনেক পাট সংগ্রহ করিয়া রেল বা জাহাজে পাঠাইয়া উহার রসিদ পাঠাইতে পারেন। যাহারা পাটের নমুনা দেখাইয়া বড় বড় পাটের খরিদ্দার অথবা মিলের এজেণ্টের নিকট বিক্রয় করিতে পারেন এরূপ কোন অংশীদারের সাহায্যে মাল প্রাপ্তির রসিদ ও দরের সর্ত্ত সম্বলিত বিল কোন ব্যাঙ্ক হইতে শত করা ৮০।৯০ টাকায় বিক্রয় করিয়া পাট খরিদের স্থানে সহজেই প্রেরিত হইতে পারে ও পুনরায় পাট খরিদ করিয়া ব্যবসায় কার্য্য লাভপ্রদ হইতে পারে।

অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদারগণের মধ্যে মতভেদ হইলেই ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়া থাকে, যে হেতু ব্যবসায় কার্য্যেও একতাই বল। ব্যবসায়ের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় যে অংশীদারগণ পরস্পর বন্ধুত্ব ও পরস্পরের সুখ্যাতি করিয়া থাকেন কিন্তু কিছুকাল পরেই পরস্পরের গ্লানি করিয়া থাকেন ও ত্রুটী প্রদর্শন করেন। এই হেতু ব্যবসায়ের প্রারম্ভেই অংশীদারগণের স্বভাবচরিত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যবসায়ে অংশীদার গ্রহণের পর অংশীদার

গণের ত্রুটী, প্রীতির সহিত উপেক্ষা করা, তাঁহাদের প্রতি হিংসাভাব পরিহার করা ও বিশ্বাসস্থাপন করাই ব্যবসায়ের পক্ষে মঙ্গলসূচক।

আরিয়ৎদার দ্বারা সকল দেশের ব্যবসায় কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। ইহাদিগের সাহায্যে দূরস্থ পল্লীগ্রামের যোত্রবান কৃষকেরা শস্য ও ফলমূলাদি বিক্রয় করিয়া থাকে। যদি ঐ সকল লোককে কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ বিক্রয় স্থানে দোকানাদি বা গুদাম রাখিয়া দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিতে হইত, এবং বিক্রীত মালের মূল্যের নিমিত্ত অনির্দ্দিষ্টকালের নিমিত্ত অনিশ্চিৎভাবে অপেক্ষা করিতে হইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে যে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত এবং তাহাদিগের লাভের পরিমাণও যে তত অধিক হইত না সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহাদের ক্ষেত্রস্থ শস্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইলে আরিয়ৎদারদের নিকট প্রেরিত হয়। মাল প্রেরণ করিয়াই বাজার দরে যে মূল্য নির্দ্ধারিত হয় বিক্রীত হইবার পূর্ব্বেই ইহারা তাহার অধিকাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং এই অর্থ দ্বারা উহার ক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও বপণীয় বীজাদি খরিদ করিয়া থাকে। বক্রী টাকা তাহারা মাল বিক্রীত হইলে আরিয়ৎদারের প্রাপ্য দিয়া পরে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সামান্য চাষীরা ঐরূপে কার্য্য করিতে পারে না কারণ তাহাদের যে মাল উৎপন্ন হয় তাহাতে হয়ত একখানি বড় নৌকাও পূর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং উহার বহুনি খরচাও বৃদ্ধি পায়, অথবা হয়ত সে ব্যক্তি একাকী বলিয়া নিজে আসিলে বৎসরের কৃষি কার্য্যের ক্ষতির আশঙ্কায় নিজে আসিতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকেই ব্যাপারিগণের নিকট শস্যাদি বিক্রয় করে এবং ব্যাপারীরা আবার আরিয়ৎদারগণের নিকট বিক্রয় করিবার নিমিত্ত তাহাদের নিকট মাল লইয়া উপস্থিত হয়। ব্যাপরীরা যে কেবল এই শ্রেণীর লোকদের নিকটই মাল খরিদ করে তাহা নহে, উহাদিগের

মধ্যে যাহারা মহাজন ও ব্যাপার করে কৃষকদিগকে পূর্ব্বে টাকা (দাদন) দিয়া বহু পরিমাণে মাল ক্রয় করিয়া আরিয়তে বিক্রয়ার্থে প্রেরণ করে। এক একটী মৌসুমের সময় তাঁহাদের মূলধনের বহুবার সদ্ব্যবহারের নিমিত্ত তাহারা আরিয়ৎদারের নিকট মাল পৌঁছাইয়াই উহার মূল্য বাবদ শতকরা ৭০।৮০ টাকা বিক্রয় হইবার পূর্ব্বেই গ্রহণ করে ও সেই টাকায় পুনরায় শস্যাদি খরিদ করিয়া আরিয়াতদারের নিকট আনয়ন করে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ আরিয়াৎদারের নিকট মাল প্রেরণ করিয়া অগ্রিম লইয়া তাহারা নয়ালির (যে সময় নূতন ধান্য ও শস্যাদির আমদানী হয়) সময় ও পাটের মৌসুমের কালে একই মূলধনে বহুবার কারবার করিয়া বিশেষরূপে লাভবান হয়।

এইরূপ যে কতশত ব্যপারী আড়িয়াতদারের নিকট মাল লইয়া উপস্থিত হয় ও অগ্রিম টাকা লইয়া যায় তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। স্বতঃই মনে হয় বুঝি আড়িয়ৎদারের টাকা রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু বাণিজ্য বিদ্যা শিক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে দেশের এক এক মৌসুমের উৎপন্ন শস্য খরিদ করিতে আড়িয়ৎদারের কেন, সরকারি কারেন্সিতেও এত টাকা মজুদ নাই। অথচ দরিদ্র কৃষক নগদ অর্থ না পাইলে আর এক বৎসরের নিমিত্ত শস্য উৎপাদন করিতে পারে না। এ অর্থ কোথা হইতে আইসে? বাজার-সম্ভ্রমের উপর বিশ্বাসের আধিক্যানুসারে ব্যবসাদারের সামান্য মূলধনও কার্য্য-কর হয়! আড়িয়ৎদার বাজার সম্ভ্রমযুক্ত বড় ব্যবসাদারকে ধারে মাল বিক্রয় করিয়া তাহার নিকট দুই তিন মাস পরে মূল্য লইবে বলিয়া একখানি হুণ্ডী (দাবিস্বত্তের নিদর্শন পত্র) লিখে; এবং উক্ত ব্যবসাদার ঐ সময়ের মধ্যে মূল্য দিবে বলিয়া স্বীকার করিলে ঐ হুণ্ডী খানি ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শন পত্রের মধ্যে গণ্য হয় অর্থাৎ আড়িয়ৎদার বাটা দিয়া ব্যাঙ্কে বিক্রয় করিয়া তুল্য মূল্য অর্থের সামান্য কিছু অল্প টাকা গ্রহণ

করিতে সমর্থ হয়েন। এই হুণ্ডীগুলি ক্রেয় বিক্রেয় না হইলে আড়িয়ৎদার এত শীঘ্র টাকা পাইতে পারেন না অর্থাৎ বাজার-সম্ভ্রম যুক্ত ব্যবসাদার যতদিন না মাল বিক্রয়ের পর টাকা প্রাপ্ত হয়েন, আড়িয়ৎদারকে ততদিন পর্য্যন্ত টাকা দিতে নাও সমর্থ হইতে পারেন। এই কারণে তিন চার মাস কাল বিলম্ব হইলে উৎপাদক বা নির্ম্মাতা তিন চার মাস মালের মূল্য পাইবে না, এবং ইহার ফলে তিন চারি মাস উৎপাদন ও প্রস্তুতি কার্য্য বন্ধ থাকিলে দেশের পাঁচ ভাগ বা চার ভাগের এক ভাগ মাল কম উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইবে অথবা দেশের সেই পরিমাণ ধননাশ হইবে। অতএব দেশের ব্যয়সংযমকারীদের অর্থে পরিপুষ্ট ব্যাঙ্কের দ্বারা এবং আড়িয়ৎদার ও ব্যাপারী দ্বারা উৎপাদিকাশক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

পাঠকের প্রথমেই মনে হইতে পারে যে যখন অংশীদারীতে ব্যবসায় কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, তখন আবার কোম্পানীর আবশ্যকতা কি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় যাহাতে অল্প মূলধন আবশ্যক, তাহা অনায়াসে পাঁচ সাত জন অংশীদারের মিলিত মূলধনে সম্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসায় সকল যেমন বিস্তৃত রেল লাইন বা ট্রাম লাইন নির্ম্মাণ বা কয়লার বৃহৎ খাদ খনন, অল্প মূলধনে সমাধা হইতে পারে না।

কোন ব্যবসায় কল্পিত হইলে প্রতিষ্ঠাতৃগণ যখন অনুমান করেন যে যে পরিমাণ মূলধনে ব্যবসায়টী সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে সেই পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা তাহাদের সাধ্যাতীত তখন কোম্পানী সৃষ্ট হইবার কারণ উপস্থিত হয়। কয়েকজন ব্যক্তি মিলিত হইয়া কোন লাভজনক ব্যবসায়ের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে ঐ ব্যবসায়ে কত মূলধন লাগিবে এবং উহা কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় বিভক্ত হইবে। ব্যবসায় কার্য্য সংস্থাপিত হইবার পর ছয়মাস বা এক বৎসর

পরে কি পরিমাণ লাভ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা উল্লিখিত হইয়া একটি অনুষ্ঠান-পত্র (prospectus) প্রকাশিত হয়। এই পত্রে আরও প্রকাশ থাকে যে নির্দ্দিষ্ট সমভাবে বিভক্ত মূল ধনের পরিমাণ যদি দশ টাকা হয়, তাহা হইলে যাহাদের নামে অংশ বিলি হইবে হয়ত প্রথমে তাহাদিগকে অংশ প্রতি ৩৲ টাকা করিয়া দিতে হইবে; ও পরে নির্দ্দিষ্ট কালান্তর কিস্তীবন্দী করিয়া বাকি টাকা পূরণ করিতে হইবে। ধনী ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি ব্যয় সংযম করিয়া মাসিক ১০ টাকাও মূলধন সৃষ্টি করিতে পারেন, তাঁহারা যদি শতাধিক টাকাও সঞ্চয় করিয়া থাকেন হয় ত ঐ টাকায় দশ খানি অংশ খরিদ করিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া, দশ টাকা দিয়া দশখানি অংশের নিমিত্ত আবেদন করিতে পারেন এবং অংশ বিলির সময় আরও বিশ ত্রিশ টাকা দিতে পারেন এবং ছয়মাস পরে যদি অংশপ্রতি দুই টাকা দিতে হয় তাহাও অক্লেশে দিয়া যাইতে পারেন। এইরূপে যাহাদের মূলধন অল্প এবং যাহারা নিজে ব্যবসায় পরিচালন করিতে অসমর্থ, তাহারাও অর্থের ব্যবহার করিয়া লাভবান হইতে পারেন এবং তাহার ন্যায় কতশত লোকের মূলধন লইয়া সম্ভূয়সমুত্থানে দেশের বাণিজ্য কার্য্য বিস্তৃত হইয়া তথাকার ধনোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

SCEURITY.

স্বস্তি।

জগতে যখন স্বত্বাস্বত্বের অবধারণ হয় নাই, তখনকার অপেক্ষা যে এখন অধিক ধন সম্পত্তি উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতেছে, এবং ঐগুলি যে বংশপরম্পরায় ভোগ দখলীকৃত হইতেছে, এবং ঐগুলিকে মূলধন করিয়া যে কত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি অন্য ধন সম্পত্তি উৎপাদন বা প্রস্তুত করিতেছেন একথা কে না স্বীকার করিবে। খাজানা দিয়া জমি চাষ করিবার সময় মনে হয়, যে পৃথিবীর আদিম অধিকারীরা খাজানা দিতে হইত না বলিয়া নাজানি কত জমিই চাষ আবাদ করিতেন; জলকর দিতে হইত না বলিয়া কত মৎস্যই জল হইতে উত্তোলন করিতেন, বনকর দিতে হইত না বলিয়া কত কাষ্ঠই সংগ্রহ করিতেন। ফলভরে অবনত বৃক্ষ লতাদি পরিশোভিত উর্ব্বর রত্নগর্ভ ক্ষেত্রমধ্যে বাস করিয়া কর্ম্মফলা বুদ্ধি, ও পরিশ্রমের অভাবে অসভ্য মানব জাতি, যে কেবল আহারের জন্য লালায়িত এরূপ নহে খাদ্য সামগ্রীর আহরণে সমস্ত সময় ক্ষেপণ করিয়া লভ্য বস্তু পাইতে তাহারা সর্ব্বদাই বিবাদশীল। জগতে দেখিতে পাওয়া যায় পরিশ্রম না করিয়া অপরের পরিশ্রমলব্ধ ধন সামগ্রী ভোগ করিবার বাসনা অনেকেরই অতিশয় প্রবল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অলস এবং কতকগুলির প্রকৃতি অতিশয় দুষ্ট। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ভিক্ষা দ্বারা জীবন অতিবাহিত করে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি পরস্বাপহরণ করিয়া জীবনাতিপাত করা আনন্দকর মনে করে। ইহাদিগ হইতে পরিত্রাণ করিতে প্রথমে শাসনবিধি ও পরে ধর্ম্মবিধির প্রবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। আজি যে কর্ম্মফলা বুদ্ধি ও পরিশ্রমের সাহায্যে সভ্যজাতি গৌরবদৃপ্ত হইয়াছে ইহা যে পূর্ব্বেকার অসভ্য মানবে ক্রমে ক্রমে

অঙ্কুরিত হয় নাই, একথা কে বলিতে পারে? আমাদের যাহা কিছু আছে উহা পূর্ব্ব হইতে মানবের কর্ম্মপরম্পরার ফল সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু মানব যখন দেখিতে ও বুঝিতে পারে যে তাহার সুকর্ম্মের ফল সে নিজে অথবা তাহার উত্তরাধিকারী তাহা ভোগ না করিয়া অপরে বলপূর্ব্বক ভোগ করিবে, তখন সুফলপ্রসূ কর্ম্ম করিতে তাহার কতদূর প্রবৃত্তি হয়? তাহার কর্ম্মফলা বুদ্ধি নিষ্কর্ম্মার বুদ্ধিতে পরিণত হয়। তখন সে ব্যক্তি হতাশ হইয়া নিকট ভবিষ্যৎ সংস্থিতির বিষয়ও চিন্তা না করিয়া অনিশ্চিন্ত আহার প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। এ সময়কার লোকের মনে কোমল বৃত্তিনিচয় কিংবা বিষয় চিন্তা অঙ্কুরিত হয় কিনা সন্দেহ। অধিকতর মূলধন সংগ্রহ করিয়া তদ্বিনিময়ে অপরের পরিশ্রম নিয়োগ করিতে সমর্থ. পূর্ব্বেকার অধিবাসী, যখন বলপূর্ব্বক অপরের শ্রমজাত লব্ধধন অধিকার করিত, তখন অপহৃত ব্যক্তির হৃদয়ে স্বদেশের ধনাগমের কথা ত উত্থাপিত হইতই না, অধিকন্তু আত্মজের ও প্রিয়ার যে ভবিষ্যতে সঞ্চিত ধনের অভাবে কষ্ট হইবে, এ কথাও মনে স্থান পাইত না। তাহারা যে দার পরিগ্রহ করিয়া অধিক সন্তান ও সন্ততির কামনা করিতেন, ইহাও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ধনহীনের ন্যায় তাহাদেরও মনে যে দানধর্ম্মের কথা উদিত হইত না,তাহাও সহজে অনুমেয়; কারণ যাহার নিজের কিছুই নাই সে কিরূপে দান করিতে পারে? আজি কালিকার যাহা কিছু দেখিতে পাই, কি বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠান যাহা দুই চারি পুরুষেও সুসম্পন্ন হইবে কিনা সান্দহ, কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যাহা ব্যক্তি বিশেষের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম পরম্পরার ফল সমষ্টি, কি অসাগর দানের সমাজ বা দূরদেশব্যাপী ধর্ম্ম সমাজ, কি উচ্চ সঙ্কল্পের মহান অঙ্কুর, কি নিজ সংসারকে আপনার করিতে শিখিয়া পরে নিজ সমাজ ও শেষে স্বদেশের হিতসাধনা, কি অন্য যাহা কিছু করিয়া আমরা

সভ্য সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার ইচ্ছা করি, এ সমস্তই উত্তম বিধি-ব্যবস্থার অন্যতম মঙ্গলময় ফলসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেখানে শাসন-বিধি নাই, সেখানে কি প্রচুর পরিমাণে সামগ্রী উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর হয়, না প্রাত্যহিক আহারের নিশ্চিততা থাকে? যদি নিজের প্রাণাতিপাত পরিশ্রমে উৎপন্ন শস্য, ব্যবহার বা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা, দস্যু বা তস্করে লাভ করিল, যদি সুবিধি-ব্যবস্থার অবর্ত্তমানে জোর যার মুলুক তার হইল, তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত হওয়া ত পরের কথা সামান্য পরিমাণেও কেহ কিছু করে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়; এবং আহারীয় সামগ্রী যদি আদৌ উৎপন্ন না হইল, প্রাত্যহিক আহার-সংস্থান কেবল দেবতাসুলভ ও কল্পনার বিষয় ভিন্ন আর কি বলিয়া অনুমিত হইতে পারে? সর্ব্বজন-সম্পত্তি, বনে বিচরণশীল পশু বা জলের মৎস্যই কেবল আহার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও, উহার প্রাপ্তিকাল নিরূপণ করা দৈবজ্ঞেরও সাধ্যের অতীত। বর্ব্বরের সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে অনশন-ক্লেশ-নিবারণ কল্পে এবং লব্ধধন কিছুকাল ভোগের নিমিত্ত রক্ষা করিতে, তাহারা সকলেই বদ্ধপরিকর। আহারীয় সামগ্রীর অন্বেষণে পরস্পরের জিঘাংসায় সকলেই প্রায় হিংস্র জন্তুর ন্যায় খাদ্যখাদক সম্বন্ধে পরিণত। তাহাদের বন্ধু নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, সমাজ নাই, স্বদেশ নাই। কয়েক দিন নিরুদ্বেগে ভোগের নিমিত্ত যদি ধন সামগ্রী সঞ্চিত না করিয়া প্রাত্যহিক আহারের অন্বেষণে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে হইল, তাহা হইলে প্রণয়, বাৎসল্য, আত্মোন্নতি বা ভগবৎ-চিন্তার অবকাশ কৈ? দুগ্ধবতী গাভী ও মেষ প্রভৃতি পশুপালন পূর্ব্বক ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া, ঊর্ণাজাত বস্ত্রাদিতে লজ্জা নিবারণ ও প্রতিদিনের আহারের নিশ্চিততায় আদি-মানব যখন বঞ্চিত হইত, তখন কি সে নিশ্চিন্ত হইয়া দাম্পত্যপ্রণয়ের

কথা মনে স্থান দিতে পারিত? যদি তাহাই না হইত তাহা হইলে বোধ হয় সতীরও সৃষ্টি হইত না। পশুতে ও মানবে মায়া, মমতা বাৎসল্য ও অন্যান্য গুণে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় উহা, কেবল সভ্যতা ও শাসন বিধির সুফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বহু দিনের সভ্য সমাজ হইতে যখন কিছুকালের নিমিত্ত শাসন-বিধি তিরোহিত হয়, অর্থাৎ কোন যুদ্ধ বিগ্রহে যখন কোন মানব সমাজ বিব্রত হয়, অথবা দেশের শান্তিরক্ষকেরা অশান্তি ঘটাইতে সুবিধা পায়, তখনকার বিভীষিকা মূর্ত্তি অঙ্কিত করিলে নিরুদ্বেগ ও অরাজকতায় বসবাসের তারতম্য উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়। এই মূর্ত্তির প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে ধনসম্পত্তি ও আহার-সংস্থানের ধ্বংস সাধিত হয়। ইহার আগমনকালে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই দুর্দ্দশা ও যাতনার মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; এবং প্রায়ই ব্যক্তি বিশেষের সমর-বুদ্ধি, বংশপরম্পরাগত পরিশ্রমলব্ধ বাঞ্ছিত ধন সম্পত্তির সমূলে বিনাশ সাধন করে। শত্রু আসিয়া সুখে বাস করিবে, বিশ্রাম করিয়া বললাভ করিবে, এই ভাবিয়া এক একখানি ইষ্টক সাজাইয়া যে সৌধমালা সমৃদ্ধ নগরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল, ঐ গুলির স্মৃতিবিলোপের প্রবল বাসনা স্বদেশহিতৈষীর মনে স্থান পাইতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় নিজ দেশীয় কৃষকের শস্য তস্কর ও দস্যু হইতে রক্ষা করণে অভ্যস্ত সৈনিকেরা অপর দেশ আক্রমণ করিলে, শত্রুকে আহার সংস্থানহীন করণাভিপ্রায়ে, তথাকার ক্ষেত্রের সঞ্চিত শস্যে অগ্নি প্রদান করিয়া থাকে।

যাহারা দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু শান্তি ভোগ করিয়া আকস্মিক অরাজকতায় যাহারা দুঃখ পায়, এবং দুঃখ পাইয়া বিপরীত অবস্থা জানিতে ও' বুঝিতে পারে, তাহারাই নিরুদ্বেগ বসবাসের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারে। স্বাভাবিকী

প্ররোচনায় স্বচ্ছন্দজাত সামাজিক বিধিব্যবস্থায় যত না স্বস্তি সম্ভবে, রাজশক্তি পরিপোষিত বিধিবদ্ধ শাসন-প্রণালীতে ততোধিক ফল হয়। এই ব্যবস্থার কল্যাণকল্প ফলে, স্থাবর সম্পত্তির অধিকার নির্দ্ধারিত হয়—ইহার পৃষ্ঠপোষকতায় দূরদর্শী, সঙ্কল্পের ভিত্তি স্থাপন করেন—ইহারই সাহায্যে ক্রমোন্নতির বিকাশ হইতে থাকে--ইহারই বলে ভবিষ্যৎ আশাপথ চাহিয়া কতশত মানব নিজ সংসার ও দেশ-হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকে। উপস্থিত সুখভোগ সংক্ষেপ করিয়া ব্যয়সংযমের দ্বারা যাহার ধনবৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং পরিশ্রমের বিনিময়ে যাহারা উৎপন্ন বা প্রস্তুত সামগ্রী লাভ করিয়া থাকেন, পরিশ্রমকাতর দস্যুতস্করেরাই তাহাদের শত্রু। দুঃশাসন ও ধৃষ্টতা প্রথমে উহার ফল হরণ করিবার ইচ্ছা করে। সমাজ এইরূপে শঙ্কিত থাকিলে ব্যবস্থাপকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সতর্কতার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। সুখময় ও দুঃখময় সময়ের আগমন অপেক্ষা আগমন-প্রতীক্ষাই আহ্লাদজনক বা ভয়াবহ। মানব যে নিজজীবনেই নিঃশঙ্কা ও নিরুদ্বেগের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করে, তাহা নহে, সন্তানসন্ততি বংশ পরম্পরাগত উপার্জ্জিত ধনসম্পত্তি ধরাবাহিক পর্য্যায়ক্রমে ভোগ দখল করিবে, এই কল্পনাসুখে মানবমাত্রেই প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া লব্ধ ধনের ব্যয়-সংযম করিয়া থাকে। একবার এই ধারণা বদ্ধমূল হইলে, তাহারা নানাবিধ সংকল্পের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় এবং উহা পরিসমাপ্ত করিতে যে কার্য্যপরম্পরা আবশ্যক হয়, স্বকীয় কর্ম্মকে তাহার একটি অংশ বলিয়া মনে করে, এবং পরবর্ত্তী বংশধরগণের ভাবী কার্য্যগুলিকে কল্পনা-সুখে সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া থাকে।

এই সকল সুখের কথা মনে হইলে, রাজার আবশ্যকতা, প্রজার রাজভক্তি ও রাজস্বের কথা সতঃই মনোমধ্যে স্থানলাভ করে। রাজা কর লইয়া কেবল যে ধর্ম্মাধিকরণের সাহায্যে তস্করের হস্ত হইতে

উৎপাদক ও প্রস্তুতিকারককে নিজ পরিশ্রমজাত কর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ করিতেছেন, এরূপ নহে, শত্রু হইতে রক্ষা, ও রেল, খাল, ও রাস্তা বিস্তার, ডাকের সুবিধা ইত্যাদি নানাবিধ মঙ্গলময় অনুষ্ঠান করিয়া সুখ শান্তির বিধান করিতেছেন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার-নির্দ্ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞা ও ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যবহারশাস্ত্রবিধি ধনাগমের পন্থা কণ্টকহীন করিয়াছে। সভ্যতার আলোক যেখানে প্রবেশ করিয়াছে, বিধিব্যবস্থার মাঙ্গল্যে কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই নিজ পরিশ্রম-বিনিময়ে যাহা কিছু লাভ করিয়াছে, তৎসমস্তই ব্যবহার ও হস্তান্তর করিবার সত্বে সত্ববান হইয়াছে। সুদূরব্যাপী আশার আলোক তাহাদিগকে ধনাগমের পন্থা দেখাইয়া দিতেছে। নিজ গৃহ, নিজ রচিত উদ্যান এবং যাহা কিছু নিজের, উহাতে সর্ব্বময় অধিকার জ্ঞানে, সকলেই সুখশান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধাস্বাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে।

কলিকাতায় অর্দ্ধোদয় যোগ ও স্বদেশ-সেবা।

(১৯শে মাঘ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ)

প্রায় সাপ্তাহিক কাল হইতে অর্দ্ধোদয় যোগ-উপলক্ষে গঙ্গাস্নানের জন্য বিভিন্ন রেলপথে সহস্র সহস্র যাত্রী কলিকাতায় সমাগত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন যোগ-উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন তীর্থে বহুযাত্রীর সমাগম হয়, কিন্তু অর্দ্ধোদয় যোগ অষ্টাদশকালের মধ্যে অত্যন্ত দুর্ল্লভ বলিয়া এবার কলিকাতায় যেরূপ জনসমাগম হইয়াছিল, বহুদিন এমন দেখি নাই। কলিকাতার গলিতে গলিতে অব্যবহার্য্য, অপরিচ্ছন্ন, জীর্ণ বত

পোড়ো বাড়ী ছিল, তাহাদের পর্য্যন্ত যেরূপ অসম্ভব ভাড়া বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা শুনিলে বিস্ময় জন্মে। প্রত্যেক বাড়ীতে যে ঘরে দুই জন লোকের বাস সঙ্কুলান হয় না, সেই ঘরে দশ জন লোককে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ; অনেকে স্থানাভাবে মুক্ত আকাশের নীচে চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া খোলা ছাদের নীচে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এইভাবে শনিবারের দিবা রাত্রি কাটিয়া গেল।

রবিবার—তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই। ঊষার শুভ্র কুজ্ঝটিকাজাল ছিন্ন করিয়া প্রভাত রবির হিরণ্যবর্ণ কিরণপ্রবাহ রাজধানীর সুরম্য হর্ম্ম্যশিখরমালা উদ্ভাসিত করিবার পূর্ব্বে কলিকাতার রাজপথসমূহ অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। কলিকাতার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত শত শত রাজপথ তরঙ্গমালাসঙ্কুল শত শত জন-প্রবাহে পরিণত হইয়াছিল। শ্রেণীবদ্ধ পিপীলিকার ন্যায় বিপুল জন-সংঘ গঙ্গাভিমুখে ধাবিত হইতেছিল। স্নানার্থী রমণী ও পুরুষ, বালক ও যুবকদিগের মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব উৎসাহ, অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ পাইতেছিল। নরদেহে শিরা ও ধমনীজালের মধ্য দিয়া রুধিরস্রোত যেরূপ প্রবলবেগে হৃৎপিণ্ড মধ্যে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ রাজধানীর রথ্যারাজি দিয়া সহস্র ধারায় জনস্রোত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। পুণ্যসলিলা গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী স্নানের ঘাটগুলি কৃষ্ণমক্ষিকাসঙ্কুল মধুচক্রনিচয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। যে দিকে চাও, সেই দিকেই বিপুল জনোচ্ছ্বাস —ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার শ্রেণীর পর শ্রেণী, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তাহার পর তরঙ্গ। পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত— যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল অগণিত মনুষ্যমুণ্ড স্রোতের আকারে গঙ্গাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। আর সেই জন-স্রোতের কোলাহল কি বিচিত্র! কি অপূর্ব্ব! যেন সুদূর সমুদ্রের অশ্রান্ত ও দিগন্তব্যাপী

কল্লোল! লোক-যাত্রার সে চাঞ্চল্য, সে উচ্ছ্বাস, সে উদ্দাম গতি, সে বিপুল কল-কোলাহল বর্ণনাতীত, কেবল অনুভবগম্য!*

ক্রমে যতই বেলা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ঘাটে, পথে, স্নানার্থী ও স্নানর্থিনীদের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; শেষে দেখা গেল, উত্তরে শ্মশানেশ্বরের ঘাট হইতে দক্ষিণে জগন্নাথ ঘাট পর্য্যন্ত অগণ্য অসংখ্য নরমুণ্ড। একদল স্নান শেষ করিয়া গৃহে যাইতেছে, আর এক দল তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। কালীঘাটে সে দিন যে দৃশ্য দেখা গিয়াছিল, তাহা বোধ হয় আমরা জীবনে ভুলিব না। কত লক্ষপতির পত্নী ও কন্যা—বুঝি চন্দ্র সূর্য্যও তাঁহাদের মুখ দেখিতে পায় না—সেই মহাপুণ্যময় দিনে জগজ্জননীর মন্দিরতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের পাশেই, দেখিলাম, অনাহারে শীর্ণ দেহ, ছিন্ন বস্ত্র-পরিহিতা বিগলিত-বসনা লোলচর্ম্মা ভিখারিণী দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বজননীর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছে। অনেকের হৃদয়ে ভক্তি, মুখ প্রীতি ও প্রসন্নতায় উজ্জ্বল, নয়নে দরবিগলিত ধারা। মনে হইল এই স্থান বুঝি শ্মশানের মতই পবিত্র; এখানে দীন দরিদ্র ও লক্ষপতি সব সমান। স্থান, কাল, সব ভুলিয়া সেই পবিত্র দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। কলিকাতার প্রায় সকল ঘাটেই বেলা ১টা পর্য্যন্ত লোকের ভীড় সমান ছিল, তাহার পর ঘাটে ভীড় কমিতে আরম্ভ করে। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতার বিভিন্ন ঘাটে প্রায় তিন লক্ষ নরনারী স্নান করিয়াছে।

ভলাণ্টিয়ারেরা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। সাধারণ বিভাগ, সেবা-বিভাগ ও সৎকার-বিভাগ। এই তিন বিভাগের আবার উপবিভাগও ছিল, কোন দল ঘাটে ছিলেন, কোন দল পথে ছিলেন, কোন দল ষ্টেশনে ছিলেন। কালীঘাটের মায়ের মন্দিরে,

* হিতবাদী।

শিয়ালদহ ও হাওড়ার রেলের ষ্টেসনে, ট্রামের রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে শত শত ভলণ্টিয়ার নানাভাবে যাত্রিগণের সাহায্য করিয়াছিলেন। মেডিকেল ভলণ্টিয়ারদের সঙ্গে নানাপ্রকার ঔষধ, ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার ফিতা ও যন্ত্রাদি ছিল। হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে যাহাতে তৎক্ষণাৎ রোগীর বা আহতের বা মূর্চ্ছিতের চিকিৎসা হইতে পারে, এবং তত্ত্বাবধানের বিলম্ব জনিত কোন বিভ্রাট না ঘটে, তাহার চমৎকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ভদ্র সন্তানেরা ডুলি ঘাড়ে লইয়া আর্ত্তের উদ্ধারের জন্য পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন,—এ দৃশ্য আমাদের দেশে নূতন. এবং প্রথম হইলেও আশা করি শেষ নহে।

এই অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে বঙ্গদেশের অতি অজ্ঞাত পল্লী হইতেও এরূপ নরনারীর সমাগম হইয়াছিল, যাহারা জীবনে কখনও কলিকাতা দূরের কথা, ইষ্টকবদ্ধ পথ ও ঘোড়ার গাড়ীও দেখে নাই, অথচ তাহাদের তীর্থযাত্রার কাণ্ডারী এক জন মাত্র পুরুষ 'সেথো'! সেই সকল 'সেথো' পল্লীগ্রামের রমণী-সমাজে যে পরিমাণেই আত্মমহিমা বিকীর্ণ করুক, কলিকাতার পথ ঘাটের সন্ধান তাহারা রাখে না; হঠাৎ কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সঙ্গী সঙ্গিনীদের রক্ষা করা দূরের কথা, আত্মরক্ষায় পর্য্যন্ত তাহাদের শক্তি নাই। এইরূপ সেথোর সঙ্গে এবার অসংখ্য যাত্রী কলিকাতায় আসিয়াছিল; এমন কি, এক এক জনের সঙ্গে ৫০।৬০টি স্ত্রী, পুরুষ ও বালক। কেবল সেথোর উপর যদি নির্ভর করিতে হইত, কিম্বা কেবল পুলিশ যদি দয়া করিয়া শান্তিরক্ষার ভার লইতেন, তাহা হইলে কত লোকের যে কি ভয়ানক দুর্গতি হইত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; কিন্তু সুখের বিষয় এখন দেশের চিন্তাস্রোত ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইতেছে, দেশের শিক্ষিত যুবকগণ আত্মত্যাগের উদার ও মহান্‌ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; ব্যক্তিগত সুখ, শান্তি, আরাম কল্যাণের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের

আশাস্থানীয় দেশীয় ছাত্রসমাজ পরের জন্য খাটিতে শিখিয়াছেন; পরের মঙ্গলের চেষ্টায় যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেছেন—ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের আত্মত্যাগের প্রথম সোপান। সে দিন আমাদের গৌরব-স্থানীয় ভলান্টিয়ারেরা পরহিত-কামনায় সুখ শান্তি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাই তিনলক্ষ যাত্রী-সমাকুল কলিকাতার রাজপথে শত শত যাত্রী গাড়ী চাপা পড়িয়া মরে নাই, গুণ্ডার হস্তে তাহাদের মুষ্টিমেয় পাথেয় লুণ্ঠিত হয় নাই, আড়কাঠির মায়াজালে বন্দী হইয়া আসামে চা ক্ষেত্রে কাহারও নির্ব্বাসিত হইবার সুবিধা ঘটে নাই; এমন কি, এই সহরের কাপুরুষ নরাধমেরাও বিদেশাগত কোন সাধ্বীর অঙ্গস্পর্শ করিবার সুবিধা পায় নাই। লোকে যেমন মহা আগ্রহে পরম যত্নে স্ব স্ব জননী, ভগিনী, কন্যার সম্মান রক্ষা করে, সেদিন ভলান্টিয়ারবেশী দলবদ্ধ বাঙ্গালী যুবকেরাও বাঙ্গালী রমণীগণের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কার্য্যনিপুণতাবশতই সেদিন কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পায় নাই। তাঁহাদের সতর্কদৃষ্টি সকল সময় সর্ব্বত্র সমান সাবধানতার সহিত এই অসংখ্য জনসঙ্ঘের শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতি ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদের তৎপরতায় কোন দিকে সামান্য বিশৃঙ্খলা পর্য্যন্ত ঘটে নাই। যে সকল যাত্রী জলে ডুবিয়া মরিতেছিল, ভলান্টিয়ারেরা সলিল-সমাধি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন; যাহাদের পুত্র কন্যা বা বৃদ্ধ জনক জননী হারাইয়াছিল, ভলান্টিয়ারেরা তাহাদিগের হারানিধি খুঁজিয়া দিয়াছেন; তীর্থস্থানে আসিয়া যে সকল নিরাশ্রয় নরনারী এই মাঘের দুরন্ত শীতে মাথা রাখিবার স্থান না পাইয়া দলবদ্ধভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, ভলাণ্টয়ারেরা তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। অনেক তস্কর, বালক বালিকা ও রমণীর অঙ্গ হইতে সেই ভীষণ ভীড়ের মধ্যে অলঙ্কার, খুলিয়া লইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সহস্রচক্ষু ভলান্টিয়ারের দৃষ্টি

অতিক্রম করিয়া তাহারা পলায়ন করিতে পারে নাই। কুমারটুলীর ঘাটে আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি, এরূপ একটা চোর একটী বালিকার কণ্ঠ হইতে হার চুরী করিয়া পলাইবার সময় ভলণ্টিয়ার হস্তে ধৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। কত যাত্রী গঙ্গাস্নানে আসিয়া পীড়িত হইয়াছে, অনেকে কলেরা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের এই বিপদে তাহাদের নিকটতম আত্মীয় পর্য্যন্ত দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে কুণ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু নিরাশ্রয় বিপন্ন ও মৃতকে ভলাণ্টিয়ারেরা পরিত্যাগ করেন নাই। পীড়িতদিগের যথাসাধ্য পরিচর্য্যা করিয়াছেন।

অর্দ্ধোদয় যোগ আমাদের ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে একান্ত দুর্লভ ও বিরল হইতে পারে, কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে আত্মত্যাগ ও সেবার এরূপ জীবন্ত ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই প্রথম। অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে সেবার জন্য ধন্য হইয়াছেন, এখনও কোন কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ মঠের সেবক সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন তীর্থে বিপন্নের ও আর্ত্তের সেবার যে মহনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা অতুলনীয়; কিন্তু দেশের সর্ব্বসাধারণ যুবকগণ, এমন কি কত সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক, সে দিন যে সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, যে কার্য্যশৃঙ্খলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এতবড় বৃহৎ ব্যাপারকে যেমন নির্ব্বিঘ্নে চালাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছে আমাদের নিরাশ, হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হইবার কোনও কারণ নাই; আবার আমরা মানুষ হইয়া নিজের ভার নিজে গ্রহণ করিতে পারিব, নিজের বিপদ নিজে দূর করিতে পারিব, যাহারা চলিতে না শিখিয়াছে তাহাদের হাত ধরিয়া চালাইতে পারিব—তাহার পূর্ব্ব-সূচনা সেই অর্দ্ধোদয় যোগের দিন দেখা গিয়াছে। সেদিন আমরা দুষ্কর সাধনার প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, সেদিন আমাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। তাই বলিতেছি, ধর্ম্মের

ইতিহাসে অর্দ্ধোদয় যোগের মহিমা অতুলনীয় হইতে পারে, কিন্তু এই অসাড় উদ্যমহীন স্বার্থপর ভারতে কর্ম্মের ইতিহাসে এই যোগের উপলক্ষে সেবক মণ্ডলীর সেবার কাহিনী অধিকতর পুণ্যময় ও পার্থিব সফলতার পরিচায়ক।

কত অর্দ্ধোদয়,—কত পুণ্যযোগ, মহাযোগ ভারতবর্ষের তপোবনে উদিত হইয়াছে; ভারতের কোটী কোটী নরনারী ঐশী-ভক্তি জাগরিত করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিয়া, পুণ্যপিপাসা চরিতার্থ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে।—কত গিয়াছে;—আবার কত আসিবে। কিন্তু ১৩১৪ সালের অর্দ্ধোদয়,—বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, বাঙ্গালীর নবজাগ্রত জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদে, নবভাবের অমর-কাহিনীর প্রথম অধ্যায়ে এই অর্দ্ধোদয়—স্মরণীয় মহনীয়—অর্দ্ধোদয় যাবচ্চন্দ্রদিবাকর স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে।

যোগ আর্য্যাবর্ত্তে নূতন নহে।—পুণ্যকামনার উচ্ছ্বাস ও ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে নূতন নহে। তপস্বী মুক্তিকাম আর্য্যাবর্ত্ত যুগযুগান্তর ধরিয়া কত যোগ, কত মহাযোগের বিপুল উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হইয়াছে। পুণ্যকাম নরনারীর, মুমুক্ষু ভারতবাসীর ধর্ম্মার্থে ত্যাগ-স্বীকার,—তীর্থদর্শন-কামনায় কষ্টসহিষ্ণু নরনারীর সর্ব্বস্ব পণও মানবজাতির তপোবনে নূতন নহে।—পারত্রিকের আশায় ইহলোকের সকল সুখের প্রলোভন ভারতবাসী ভিন্ন এ জগতে আর কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু তাহাও এ ভারতে নূতন নহে। তীর্থযাত্রীর কঙ্কাল-কণ্টকিত শুভ্রতুষারকিরীটী হিমাচল তাহার সাক্ষী।—গঙ্গা, যমুনা নর্ম্মদা গোদাবরী প্রভৃতি পুণ্যনদী,—যুক্তবেণী ও মুক্তবেণী,—বারাণসী, মথুরা বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র দ্বারকাপুরী ও শতশত পুণ্যতীর্থ,—নাগ, জ্বালামুখী প্রভৃতি পুণ্য মহাপীঠ তাহার সাক্ষী। হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি মুক্তিকামী তীর্থযাত্রীর কঙ্কালে পুষ্ট ও পবিত্র হইয়াছে। এ ভারতে তাহা চিরপুরাতন।

১৩১৪ সালের অর্দ্ধোদয়,—তথাপি নূতন। পুণ্য-ভারতেও এই চিরপুরাতন 'যোগ' সম্পূর্ণ অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নূতন ভাবের অগ্রদূতের ন্যায় ভাবী 'নূতনে'র ভেরী—জীমূতমন্দ্রে নিনাদিত করিয়াছে।—এই যোগে বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে—হৃদয়ে হৃদয়ে,—মর্ম্মে মর্ম্মে যে 'যোগ' ঘটিয়াছে,—আত্মবিস্মৃত ভারতে তাহা নূতন। অর্দ্ধোদয়! তোমার 'যোগ' নাম সার্থক! তুমি আজ বাঙ্গালীকে যে যোগসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছ,—বিজয়ার কোলাকুলি এবং রাখীর উপরে যে সোনার শৃঙ্খলের গ্রন্থি দিয়াছ,—তাহা যুগযুগান্তর অটুট থাকুক! তুমি যে মহাশিক্ষায় বাঙ্গালীর উদীয়মান তরুণ-সম্প্রদায়কে দীক্ষিত করিয়াছ—তাহা সমগ্র স্তিমিত জাতির হৃদয়ে কর্ম্মময় বীজ-মন্ত্রে উৎকীর্ণ হউক! তুমি যে মহাভাবে সমগ্র বঙ্গ উদ্বেল উচ্ছাসিত ও অনুপ্রাণিত করিলে,—বাঙ্গালার শ্মশানের সমস্ত বিদ্বেষ, হিংসা ও স্বার্থপরতা, ধৌত বিলুপ্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া সেই মহাভাবের উচ্ছ্বাস সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত প্লাবিত করুক! *

সপ্তদশ বর্ষের পর আবার অর্দ্ধোদয় যোগ হইয়া গেল। কোটি কোটি হিন্দুর জাগ্রত জীবন্ত শাশ্বত শান্তমূর্ত্তি দেখাইবার নিমিত্ত, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সুন্দর স্বচ্ছ স্নিগ্ধ সরল জ্বলন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী পূর্ণ প্রতিমা এবং কোটি কোটি সাক্ষর নিরক্ষর হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণময়তার প্রাণোন্মাদিনী মহা সম্মিলনী এবং পুণ্যপূত ভাগীরথী-সলিলে কোটি কোটি ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, অন্ধ, খঞ্জ, নিত্য ধর্ম্মে মতিমান কত রুগ্ন মুমুর্ষের আকুলতা ব্যাকুলতা একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সহিত গঙ্গাস্নান ও পূর্ণ অবগাহনের জাজ্জ্বল্যমান ছবি মানসপটে গভীরভাবে অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত, এবারকার অর্দ্ধোদয় যোগ শেষ হইয়া গেল। কোটিকল্পের বিধর্ম্ম বিপ্লবে অজর অক্ষর অজয় অমর সনাতন হিন্দুধর্ম্মের

---

* বসুমতী (কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত)।

পাষাণভিত্তি যে বিচলিত হইবার নহে, তাহার সার্থকতা প্রতিপাদন করিতে এবং উদীয়মান তরুণ যুবকদিগের কার্য্যকুশলতা, উদ্যমশীলতা ও নীরবে অবনতশিরে অচল অটল হিমাদ্রির মত সহিষ্ণুতা, সংযম ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিতে এবার অর্দ্ধোদয় যোগ আসিল ও চলিয়া গেল বটে ; কিন্তু যে আদর্শ রাখিয়া গেল, তাহা ভাবিলে, আলোচনা করিলে ও অনুসরণ করিলে, হৃদয়ে এক নূতন ভাবের উদয় হয়। মনে হয় এই স্বার্থপর ও স্তিমিত-হৃদয় বঙ্গবাসীর বাক্‌পটুতা বুঝিবা কার্য্য-কারিতায় পরিণত হইতে পারে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে স্বদেশ-সেবা যে প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয় বঙ্গবাসী ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিবে। বহুপূর্ব্বে কবি লিখিয়াছিলেন—

কবে প্রাণ জাগিবে তব প্রেম গাহিবে
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় যাচিবে
নর নারী মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি ॥

যাহা কবির কল্পনার সামগ্রী, আজ তাহা কঠোর সত্যে পরিণত হইয়াছে। নর নারীর সেবায় সেবকবাহিনীর অসীম আগ্রহ ও আত্মবিসর্জ্জন স্বদেশ-সেবার চরম আদর্শরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে দলাদলী নাই বলিয়া সকলেরই অনুকরণীয় ও পরোপকার ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ক্ষুদ্র স্বার্থ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া স্বইচ্ছায় অদূরদর্শী ও পরোপকারপ্রবৃত্তিশূন্য বহুসংখ্যক বঙ্গবাসী, এইরূপ স্বদেশ সেবার সুযোগ সম্মুখীন্ হইলে সর্ব্বান্তঃকরণে যতই যোগদান করিয়া সুখানুভব করিবেন, ততই স্বগ্রাম ও স্বদেশবাসী, সহানুভূতি সম্ভূত সুখশান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধাস্বাদ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারিবেন।

(২৫) দীর্ঘসূত্রতা
(২৬) আলস্য
(২৭) অতিরিক্ত ধনতৃষ্ণা
(২৮) স্বার্থপরতা
(২৯) বাণিজ্য
(৩০) কৃষি ও শিল্প
(৩১) গৃহপালিত পশু
(৩২) বঙ্গদেশের ঋতুসকল
(৩৩) একটী নদী
(৩৪) রেল্ পথে
(৩৫) পোষ্টবিভাগের আবশ্যকতা
(৩৬) মুদ্রাযন্ত্র
(৩৭) কয়লার আবশ্যকতা
(৩৮) ভূমিকম্প
(৩৯) হরিশ্চন্দ্র
(৪০) ধ্রুব
(৪১) একলব্য
(৪২) নলদয়মন্তী
(৪৩) সীতা চরিত্র
(৪৪) আয়েষা চরিত্র
(৪৫) বড়লোকের জীবনের উপকারিতা
(৪৬) মহানগরী (কলিকাতা) দর্শন

The Bengali Composition. (রচনা পদ্ধতি) **price 4 annas only should be in the possession of all candidates to enable him to avoid common errors, It contains valuable hints to answer University questions.**

ধনবিজ্ঞান—দ্বিতীয় সংস্করণ ৸০

বাণিজ্য ৸০

The Bengali—

Political Economy is precticaily an untrodden and unfamiliar ground to the majority of our students, only a handful taking it up as a subject for special study while going up for the higher University examinations, while the larger public, though perhaps familiar with the phenomena, are in the dark as to the principles that underlie them —a state of things which would not have come to pass if the Science of Wealth had been popular and what is more, had a convenient vehicle for reaching the masses. Prof. Sen's book seeks to supply that medium and, we must say, has supplied it with conspicous success. Bengal is now at the threshold of commercial life and the publication of such a book as this cannot but be opportune, and bearing in mind the fact that it has been written by one who has made the subject his special study it deserves to be highly valued by our countrymen.

হিতবাদী—গ্রন্থকার যে পথে প্রবেশ করিতে শিখাইতেছেন, তাহা অনভ্যস্ত ও নূতন। সুতরাং এমন প্রয়োজনীয় বিষয়ে এ নবীন পথের প্রবর্ত্তক সফলমনোরথ না হইলে আমাদিগের লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা থাকিবে না।

বঙ্গবাসী—বাঙ্গালা ভাষায় এমন বিশদভাবে সহজ সরল ক্রমে ধনবিজ্ঞানের পুস্তক আর কেহ লেখেন নাই। আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এ গ্রন্থের আদর হইবে।

"I have read with much pleasure Prof. G. K. Sens's Dhanabijan (Science of Wealth). The author seems to know his subject well and has been able to present a clear and at the same *time full* account of some of the difficult problems of economics within the limited space of his book. The Indian illustrations are specially appropriate. Such a book is most opportune at the present moment, and it deserves a very wide circulation.

Sd.—J. N. GUPTA, M. A., I. C. S., officer on special duty (to review the present position of the industries of the province).

I have read Babu Girindra Kumar Sen's Dhana. bijnan (a treatise on the Science of Wealth) with great pleasure. The author deservs every encouragement, as the work is the first attempt made by a scholar of the Calcutta University to set forth in the vernacular the leading principles of political economy, a subject little understood in this country. He has successfully overcome the difficulty of rendering economic terms into Bengali; and I have no hesitation to say that the work will be very useful and interesting to those who have not the time and opportunnity to read standard works on the subject in English.

(Sd.) Bepin Chandra Sen, M. A., B. L., Professor of History & Economics, Lecturer to the University of Calcutta.

85 Grey street, Calcutta, January 21 1907.

I have now carefully gone through your books

Dhanabijnan and Banijya. They are the first books of their kind in Bengali and the principles of political economy and commerce which is a part of the former have been carefully and with great simplicity enunciated and explained in them. Our countrimen take very little interest in this useful branch of study. If they had generally learned and understood the broad principles of pollitical economy and commerce, much of the difficulties of our present situation brought on by practical antagonism to them would have been avoided. I wish these books of yours were largely read. They are of easy study.

(Sd.) Sarada Charan Mittra, Judge, High Court & Roychand Scholar in pollitical Ecenomy.

The book Dhananbijan of which you have so kindly sent me a copy, I have seen already. It is perhaps the first of its kind in Bengali and is a good book and certainly deservs encouragement.

(Sd.) GOORoODAS BANERJEA,

Formerly Vice-Chanallor of the University of Calcutta and Judge of the High Court, Calcutta.

"I have read Babu Girindra Kumar Sen's Dhanabijnan. It is the first book on political economy in the Bengali language that I have come accross. I was surprised to find that the subject had been treated with such masterly lucidity, in spite of the great difficulty in expressing the thoughts in a strange and forced language. The illustrations taken from Indian life, make the book particularly accessible to the young Indian students. The book is only an elementary treatise for beginners, and while I offer my congratulations to the gifted author on his success in this venture, I trust that he will go further and give us an exposition of the higher and more difficult principles of this important science.

(Sd). K. C. De, M. A., I. C. S., Register, Co-operative Credit Societies, Eastern Bengal and Assam.